ত্বকের যত্ন
ত্বকের অসুখ

ডা. সজল আশফাক
ডা. সাইফুল কবীর

সূচি

বয়স্ক ত্বকে বিরূপ পরিবর্তন

বয়স বাড়ার (৩০ অথবা ৪০-এর পর) সাথে সাথে বিভিন্ন অঙ্গ-প্রতঙ্গে পরিবর্তন (ক্ষয়) দেয়া যায়। স্বাভাবিকভাবে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয় এবং কখনও কখনও অসুখ আকারে আবির্ভূত হয়। কখনও কখনও বা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যে সমস্ত পরিবর্তন বা অসুখ বয়স বৃদ্ধির কারণে হয়ে থাকে তার বর্ণনা ক্রমান্বয়ে দেয়া হলো।

প্রুরিটাস সেনাইলিস (Pruritis Senilis) : শরীরের চামড়া যেন শুকিয়ে না যায় সে জন্য যে উপাদানটির ভূমিকা বেশি তার নাম সেবাম (ফ্যাট)। এটি সেবাসিয়াস গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ত্বকে নিঃসরিত গ্রন্থি থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী ত্বকে নিঃসরিত হয়ে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে ত্বকে সেবামের আধিক্য কমে যেতে থাকে। ফলে চামড়া শুষ্ক বা খসখসে হয়ে যায়। আর এ শুষ্কতার কারণে চুলকানির উদ্রেক হয়।

যা এন্টিহিস্টিমিন বা চুলকানি কমানোর ওষুধ সেবনে খুব একটা উপকার হয় না। করণীয় তা হচ্ছে গোসলের পরপরই (শরীর শুকিয়ে যাওয়ার পূর্বেই) শরীরে তেল (অলিভ অয়েল) বা (লিকুইড পেরাফিন বা গ্লিসারিন) মাখা।

জেরটিক একজিমা (Xerotic Eczema) : ত্বক শুষ্ক হয়ে যাওয়ার ফলে চুলকাতে চুলকাতে যে একজিমা হয় তাকেই জেরটিক একজিমা বলে। শীতকালে এ সমস্যাটি হয়ে থাকে বেশি। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা কমে যায়, পাশাপাশি বয়স বৃদ্ধির কারণে ত্বক এমনিতেই শুষ্ক হয়ে যায়। এ দুটো কারণ মিলিয়ে চুলকাতে চুলকাতে একজিমার আকার ধারণ করে (হাত ও পায়ে বেশি)। এমতাবস্থায় সাবান যত কম ব্যবহার করা যায় ততই মঙ্গল। বার বার গোসল বা অতিরিক্ত সময় ধরে গোসলের কারণেও একজিমার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। গোসলের পরপরই (শরীর শুকিয়ে যাওয়ার আগেই) ময়েশ্চারাইজার বা তেল জাতীয় জিনিস মেখে নিলে উপকারে আসবে। "ঘা"-এর পরিমাণ যদি বেশি হয় বা পেঁকে যায় (ইনফেকশন) তবে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন।

চেরী এনজিওমা (Cherry angioma) : সাধারণভাবে বুঝাতে গেলে এটাকে ভাল তিল বলা যেতে পারে, যদিও এটি তিল জাতীয় নয়। গোলাকার সামান্য উচুঁ লাল বর্ণের তিলের মতো দেখতে। ত্রিশোর্ধ বয়সে শরীরে লাল তিল নেই এমন ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যাবে না। সত্তর বয়সে সবারই কিছু না কিছু লাল তিল থাকে। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে লাল তিলের সংখ্যা বেড়ে যাওয়াতে অনেকেই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। কোন ক্ষতি করে না বলে এ জাতীয় তিলের কোন চিকিৎসার প্রয়োজন নেই। তবে ইলেক্ট্রিক মেশিনে (electrodesication) খুব সহজেই এটি নির্মূল করা যায়। প্রয়োজনে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

সেনাইল লেনটিজিন (Senile Lentigines) : সাধারণভাবে বলতে গেলে এটি এক ধরনের তিল। তিল সাধারণত বাচ্চা বয়সে বা যে কোন বয়সেই হয়ে থাকে। বার্ধক্যে এ জাতীয় তিল, সূর্যের আলো বেশি লাগে এমন জায়গায় (হাতে এবং কপালে) হয়ে থাকে। আঁকাবাঁকাভাবে গোলাকার কালো বর্ণের হয়ে থাকে। এ জাতীয় তিল থেকে ক্যান্সারের কোন আশংকা নেই এবং এটির কোন চিকিৎসারও প্রয়োজন নেই।

টেলানজায়াকটেসিয়া (Telangiectasia) : এ ক্ষেত্রে চামড়ার রক্তনালী প্রসারিত হয়ে থাকে এবং তা খালি চোখেই দেখা যায়। অনেক বয়স্ক ব্যক্তির বেলাতেই নাকের দুই পাশে লাল লাল প্রসারিত রক্তনালী দেখা যায়। যে ব্যক্তির বয়স বেশি সে তত বেশি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে এসে থাকে। আর এই অতিরিক্ত সূর্যের আলোর কারণে ফর্সা চামড়াতে প্রসারিত রক্তনালীর পরিমাণ বেড়ে যায়। এ বিষয়টি খুব স্বাভাবিক ব্যাপার এবং এটির কোন চিকিৎসা নেই বা প্রয়োজনও নেই।

পারপুরা (Purpura) : ১ থেকে ৫ সেঃমিঃ আকারের রক্তক্ষরণ, বৃদ্ধ বয়সে সাধারণত হাতের (Fore arm) বাইরের দিকে হয়ে থাকে। বয়োবৃদ্ধির সাথে সাথে রক্তনালীর আশপাশের কোলাজেন ফাইবার কমে যেতে থাকে এবং স্বাভাবিকভাবেই বা সামান্য একটু আঘাতেই রক্তনালী থেকে চামড়াতে রক্তক্ষরণ হয়ে থাকে এবং তা লালচে আকারে দেখা যায়। এ বয়সে যে কোন আঘাত বর্জন করাই এর প্রতিকার। যদি রক্তক্ষরণ হয়েই থাকে তবে তা বিনা ওষুধে নিজ থেকেই আস্তে আস্তে কমে যেতে পারে। তবে ত্বকে রক্তক্ষরণের আরও অনেক কারণ থাকে বলে, একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়াই মঙ্গল।

সেনাইল ইলাসটোসিস (Senile Elastosis) : বয়স্ক ব্যক্তি বেশি দিন সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসে। এ ক্ষেত্রে ফর্সা ত্বকবিশিষ্ট ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে সূর্যের অতি বেগুনীরশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করার জন্য মেলানিন পিগমেন্ট-এর স্বল্পতার কারণে, মুখ এবং হাতের ত্বক (যেখানে যেখানে সূর্যের আলো বেশি লাগে) হলুদ বর্ণের হয়ে যেতে থাকে। ত্বকের রেখাগুলো স্পষ্ট হয়ে যেতে থাকে এবং ত্বক একটু মোটা হয়ে যায়। তাই সূর্যের আলো যেন কম লাগে সে দিকে নজর রাখতে হবে। প্রয়োজনে সান ব্লকার ব্যবহার করা যেতে পারে।

ত্বক ক্যান্সার (Carcinoma) : ত্বকে ক্যান্সার যে কোন বয়সেই হতে পারে। তবে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এর মূল কারণ সূর্যের অতি বেগুণী রশ্মি। বয়স যার যত বেশি সূর্যের আলোর সংস্পর্শে আসা হয় তার তত বেশি। সারাদিন রৌদ্রে থাকতে হয় এমন পেশাদারদের ত্বকে ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বেশি। যেমন- কৃষক, রিক্সা চালক, নৌকার মাঝি, খেলোয়াড় (ক্রিকেট)। তা ছাড়া গায়ের রং যাদের ফর্সা অর্থাৎ ফর্সা ত্বকে মেলানিন কম থাকাতে তা সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি থেকে ত্বককে রক্ষা করতে অক্ষম হয় বলে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে।

বৃদ্ধ বয়সে শরীরে কোথাও (বিশেষ করে রৌদ্রে লাগে এমন জায়গাতে যেমন্ মুখ, হাত) যদি কোন ক্ষতের সৃষ্টি হয় বা দিন দিন বৃদ্ধি পেতেই থাকে অথবা কোন কালো দাগ আকারে আস্তে আস্তে (আঁকা বাঁকাভাবে গোলাকার) বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে একজন

বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক (চর্ম অথবা সার্জারি)-এর শরণাপন্ন হওয়া উচিত। ছোট বেলা থেকেই ছিল এমন বড় আকারের কালো তিন (Nevus) থেকেও ক্যান্সার দেখা দিতে পরে। যদি হঠাৎ তিলের আকার বড় হতে থাকে, রং-এর পরিবর্তন হতে থাকে, চুলকায় অথবা চুলকালে সামান্য রক্তক্ষরণ হয় (যে কোন একটি উসর্গ) তবে সাথে সাথেই চিকিৎসরেক পরামর্শ নেয়া উচিত।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

ত্বক ফেটে ধূসর বর্ণ হওয়া

❐ শীতের শুরুতেই প্রতি বছর কারো কারো ত্বক ফেটে ধূসর বর্ণের হয়ে যায়। এমনকি গরমেও তার রেষ থেকে যায়। অলিভ অয়েল মেখেও উপকার পাওয়া যায়না। এর প্রতিকার কী ?

● এ জাতীয় সমস্যাকে Xerosin বলে। অর্থাৎ ত্বকে সেবাম বা তেল জাতীয় পদার্থের অভাব। সুতরাং শীতকালে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করতে হবে। সস্তায় সবচেয়ে ভালো ময়েশ্চারাইজার হচ্ছে গ্লিসারিন। দামী ময়েশ্চারাইজার কস্‌মেটিক্‌সের দোকানে পাওয়া যায়। ময়েশ্চারাইজার মাখার নিয়ম হচ্ছে গোসল বা হাত পা ধোয়ার পরপরই অর্থাৎ ত্বক মোছার পর ভেজাভেজা ভাব থাকা অবস্থাতেই ময়েশ্চারাইজার মাখতেহবে। গ্লিসারিনের অতিরিক্ত আঠাভাব আলতোভাবে ভেজা তোয়ালে দিয়ে চেপে মুছে নেয়া যেতে পারে। তবে ঘষে মোছা ঠিক হবে না, তাতে গ্লিসারিন উঠে আসবে।

হাত ও মুখমণ্ডল কালো

❐ অনেকেরই শরীরের তুলনায় হাত ও মুখমণ্ডল কালো। এ সমস্যার সমাধান কী ?

● সম্ভবত মুখমণ্ডল ও হাত রোদের সংস্পর্শে বেশি আসে বলেই এমনটি হয়। তাই রোদে বেরোবার সময় মুখে, হাতে কিংবা শরীরের যেসব স্থান রোদের সংস্পর্শে আসে সেখানে সানস্ক্রীন ক্রিম, যেমন- এসপিএফ-১৫ লাগানো যেতে পারে। এই ক্রিমের কার্যকরিতা মোটামুটি ঘন্টা তিনেক থাকে। এছাড়া রোদে ছাতা ব্যবহার করা যেতে পারে। শীতকালে সমস্যাটি বেশি হয়। কারণ শীতে রোদের উত্তাপ কম থাকে বলে লোকজন রোদে বেশিক্ষণ থাকে এবং শরীরের রং বেশি কালো হয়ে যায়।

সব সময়ে ঠোঁট ফাটা

❐ অনেকের কি-গ্রীষ্ম কি-শীত সব সময় ঠোঁট ফাটে। এ অবস্থায় করণীয় কী ?

● সব সময় ঠোঁট ফেটে থাকার কারণ অনেক। তার মধ্যে অন্যতম কারণটি হচ্ছে জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর অভ্যাস। প্রথমত এ অভ্যাসটি ত্যাগ করতে হবে। এছাড়া আর যা করতে হবে তা হলো গোসল, আহার ইত্যাদি শেষ হবার সাথে সাথেই অর্থাৎ ঠোঁট পুনরায় শুকিয়ে যাবার আগেই ঠোঁটে ভেসলিন বা গ্লিসারিন

মাখার অভ্যাস করতে হবে। যদি এতেও কাজ না হয় তাহলে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধ নিতে হবে।

ঠোঁটের চামড়া ওঠা

❒ অনেকেরই ঠোঁটে একদিন পরপর সাদা সাদা চামড়া ওঠে। প্রতিদিন চামড়া টেনে তোলাতে ঠোঁট মোটা হয়ে যায়। এটা কি কোনো রোগ ? এর প্রতিকার কী ?

● বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগে ঠোঁটের চামড়া এভাবে উঠে থাকে, সেক্ষেত্রে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নেয়াই উত্তম। যদি চর্মরোগের কারণে চামড়া না ওঠে তাহলে যা করতে হবে –

(এক) চামড়া টেনে তোলা যাবেনা। এতে সমস্যাটা বেড়ে যাবে।

(দুই) জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভেজানো যাবেনা।

(তিন) গোসল, মুখ ধোয়া এবং আহারের পরপরই ঠোঁটে ভেসিলিন মাখতে হবে।

ঠোঁটে লিপস্টিক ও ক্যান্সার আতংক

❒ কারো কারো ধারণা ঠোঁটে লিপস্টিক লাগালে ঠোঁটে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কথাটা কি সত্য ?

● না, আদৌ সত্য নয়। লিপস্টিক লাগালে ঠোঁটে ক্যান্সার হবার কোনো ঝুঁকি নেই তবে লিপস্টিকে এলার্জি হতে পারে। যদি এলার্জি হয় তাহলে লিপস্টিক ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে।

বিনা ধুমপানে কালো ঠোঁট

❒ অনেকে ধূমপান করেন না কিন্তু তা সত্ত্বেও ঠোঁট কালো হয়। এর সমাধান কী ?

● ধূমপান না করলেও অনেকের ঠোঁটের রং কালো হতে পারে। এতে করণীয় কিছুই থাকেনা। কেউ কেউ ঠোঁটে সানস্ক্রীন ক্রিম ব্যবহারের কথা বলে থাকেন। সানস্ক্রীন ক্রিম ব্যবহার করে সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি থেকে ঠোঁটকে রক্ষা করা যায়। তবে অনেকের অভ্যাস থাকে জিহবা দিয়ে ঠোঁট ভেজানোর। এ অভ্যাসের কারণে ঠোঁট কালো হতে পারে। অভ্যাসটি ত্যাগ করলে উপকার পাওয়া যায়।

মুখে তিল

❒ কারো কারো মুখে প্রচুর তিল দেখা যায়। তিলের সংখ্যা যাতে করে আর না বাড়ে সেজন্যে কোনো ব্যবস্থা আছে কি ? মুখের তিল নির্মূল করা কি সম্ভব ?

● মুখে তিল হবেনা বা তিলের সংখ্যা বাড়বে না এমন কোনো ব্যবস্থা নেই, তবে মুখে তিল হলে সেগুলো নির্মূল করা সম্ভব। এক্ষেত্রে Electrofulgaration করে তিল নির্মূল করা হয়।

তিল নিয়ে শংকা

❐ কারো কারো শরীরে অনেক তিল থাকে। বেশি তিল থাকলে কি ক্যান্সার হয়।

● ক্যান্সার হওয়ার ক্ষেত্রে বেশি তিল বা কম তিলের কোনো সম্পর্ক নেই। আর তিল থাকলেই যে সেই তিল থেকে ক্যান্সার হবে তারও কোনো যুক্তি নেই। তিলের অনেক প্রকারভেদ আছে। সব তিল থেকে ক্যান্সার হয়না। তবে যদি দেখা যায় যে হঠাৎ করে কোনো তিলের আকৃতি দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, চুলকানির উদ্রেক হচ্ছে কিংবা যদি তিলে রক্তক্ষরণ হতে থাকে অথবা একই তিলের বিভিন্ন অংশের রং বিভিন্ন হতে থাকে তবে সাথে সাথে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হতে হবে। প্রাথমিক পর্যায়ে অপারেশন করে তিলটি ফেলে দিলে বিপদের ঝুঁকি কমে যায়।

শরীরে তিল

❐ কারো কারো শরীরে বা তলপেটে একটি বা দুটি বড় তিল থাকে। নিজে নিজে কেটে ফেলার পর আবার তা গজায়। এভাবে তিল কাটতে থাকলে কোনো অসুবিধা আছে কি ?

● তিলকে বার বার আঘাত না করাই উত্তম। কারণ এতে বিপদের ঝুঁকি বেড়ে যায়। সবচেয়ে ভালো হয় চিকিৎসকের মাধ্যমে অপারেশন করে পুরা তিলটি গোড়া থেকে ফেলা দেয়া। নিজে নিজে কখনো এভাবে তিল কাটা উচিত নয়।

মুখে বাদামী রঙের তিল

❐ কারো কারো মুখে বাদামী রঙের তিল দেখা যায় এর কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে কি ?

● মেডিকেল পরিভাষায় এটাকে ফ্রিকেল বলে। অবশ্যই এর চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে। তবে কোন ওষুধ প্রয়োগে এটি নির্মূল করা যায় না। কেমিক্যাল কটারি বা ইলেক্ট্রোফালগারেশন করে এটিকে নির্মূল করা যায়। এটি চর্ম বিশেষজ্ঞ করে থাকেন।

তিলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ

❐ কারো কারো মুখমন্ডলে তিলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ বের হয়। এগুলোর সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলে। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ?

● এ জাতীয় সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় Dermatosis papulosa অথবা Verruca plana বলে। ইলেকট্রোফালগারেশন করে খুব সহজেই এগুলোকে নির্মূল করা যায়। এজন্যে চর্ম বিশেষজ্ঞর পরামর্শ নিতে হবে।

তিল যদি তাল হয়

শরীরে কোথাও না কোথাও তিল নেই এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। জন্মের প্রথম থেকেই শরীরে তিল দেখা দিতে থাকে এবং বয়স বাড়ার সাথে তা সংখ্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকে। ২০-২৫ বছর বয়সে তিলের সংখ্যা কোন ব্যক্তির শরীরে সর্বাধিক হয়ে থাকে এবং তা সংখ্যায় গড়ে ৪০টির মতো দাঁড়ায়। মহিলাদের তিলের সংখ্যা ছেলেদের তুলনায় বেশি থাকে এবং ফর্সা ত্বকে তুলনামূলকভাবে তিলের সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে।

শরীরের এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তিল হয় না। গালের তিলকে অনেক সময় বিউটি স্পট হিসাবে গণ্য করা হয়। কখনও বিভিন্ন অবস্থানে তিলের উপস্থিতিকে কুসংস্কার হিসাবেও মনে করা হয়, যেমন- প্রচলিত কুসংস্কার হচ্ছে ঘাড়ে তিল থাকলে আততায়ীর হাতে মৃত্যু হতে পারে। আবার কোন মহিলার ঠোঁটে তিল থাকলে বলা হয় স্বামী তাকে খুব বেশি আদর করবে ইত্যাদি --- আর ও অনেক কিছু।

তবে এই লেখার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তিলের প্রকারভেদ সম্পর্কে একটু জানা এবং তিলের কোন বিপজ্জনক দিক আছে কি-না ও এর চিকিৎসা ব্যবস্থা কি সে সম্পর্কে জেনে রাখা। চিকিৎসা বিজ্ঞানের হিসাবের বাইরে খুব সাধারণ ভাষায় তিলকে দু'রকম বলা যেতে পারে। প্রথমটি হচ্ছে, গাঢ়কালো রঙের তিল-এগুলো কখনও কখনও ত্বকের সঙ্গে একই স্তরে (অর্থাৎ কোন উঁচু ভাব নেই), অথবা একটু উঁচু উঁচু ভাব এবং কোন কোনটিতে কালো মোটা পশম নিয়ে দেখা দিয়ে থাকে। এ জাতীয় তিলকে মোল বলা হয়। এ জাতীয় তিলের একটা বিপজ্জনক দিক আছে, আর তা হচ্ছে-এ জাতীয় তিলে হঠাৎ ক্যান্সার হতে পারে। যা কিনা সঠিক সময়ে চিকিৎসা না নিলে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। তবে এ জাতীয় কোন তিল ক্যান্সারের দিকে ধাবিত হচ্ছে কি-না, তার কিছু পূর্ব লক্ষণ থাকে –

১। তিলটি হঠাৎ বড় হয়ে যাওয়া। অর্থাৎ অনেক দিন বা বছর যাবত তিলের আকার প্রায় একই ছিল কিন্তু হঠাৎ আকারে বেড়ে যাচ্ছে। এই বেড়ে যাওয়াটা তিলের চারদিকে সমভাবে নয়, যে কোন একদিকে একটু বেশি।

২। রঙের পরিবর্তন। অর্থাৎ অনেকদিন যাবত যে রং ছিল তা আর থাকছে না।

৩। হঠাৎ করে একটু কষ কষ ভাব হওয়া, একটু চল্‌টা ওঠা অথবা রক্তক্ষরণ হওয়া অথবা একটু ছুলে যাওয়া।

৪। তিলের পুরুত্ব বেড়ে যাওয়া, যা আঙ্গুল দিয়ে অনুভব করা যায়।

৫। ব্যথা অনুভব হওয়া।

৬। প্রধান তিলের আশপাশে ছোট ছোট নূতন তিল দেখা দেয়া।

এইসব পরিবর্তনগুলোর যে কোন একটি পরিবর্তন দেখা দিলে সাথে সাথেই (দেরি না করে বা হোমিওপ্যাথ খেয়ে সময় নষ্ট না করে) একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এ জাতীয় পরিবর্তন দেখা দিলে তিলটি সার্জারি করে ফেলে দেয়াই নিরাপদ। ফেলে দেয়া তিলের হিস্টোপ্যাথলজিক্যাল টেস্ট (বায়োপসি) করে ক্যান্সার

হয়েছে কি-না নিশ্চিত হতে হবে। যদি ক্যান্সার নাও হয় তবুও ফেলে দেয়াটা নিরাপদ। কারণ যে কোন সময় এটি থেকে ক্যান্সার হয়ে যেতে পারে। তখন চিকিৎসা নিতে দেরি করলে ক্যান্সার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং তা চিকিৎসা ক্ষমতার বাইরে চলে যেতে পারে।

আরেক ধরনের তিল হয়, যাকে সাধারণ ভাষায় তিল বললেও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ফ্রিকেল। এ জাতীয় তিলকে বাদামি রঙের তিল বলা হয়। ফ্রিকেল কি জাতীয় তিল, তা সাধারণ ভাষায় বোঝাতে হলে বলতে হয়, সাদা চামড়ার লোকদের মুখে ছিট্ ছিট্ তিল হয়। সান বাথে এর সংখ্যা বেড়ে যায়। ফর্সা ত্বকের মহিলারা এ জাতীয় সমস্যায় ভুগে থাকেন বেশি। এ জাতীয় তিল থেকে ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা নেই। তবে সংখ্যায় বেড়ে গেলে দেখতে বিশ্রী লাগে। অবিবাহিত মেয়েরা সামাজিকভাবে একটু সমস্যায় পড়েন। তবে ভাবনার কিছু নেই। বর্তমানে এর চিকিৎসা ব্যবস্থা বেরিয়েছে। ইলেক্ট্রনিক মেশিনের সাহায্যে এ জাতীয় তিলকে ইলেক্ট্রোফালগারেশন করে খুব সহজেই নির্মূল করা যায়।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভ্যাব্য সমাধান

ব্রণ

❒ কারো কারো মুখে প্রচুর ব্রণ ওঠে, দেখতে বিশ্রী লাগে। ব্রণ থেকে মুক্তির উপায় কী?

● ব্রণ আর হবেনা এমন চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিস্কৃত হয়নি। এটি যাদের হয় তাদের একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত হতেই থাকে। তবে চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্রণের পরিমাণ কমিয়ে দেয়া যায়, ব্রণের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থেকে মুখমণ্ডলকে রক্ষা করা যায়। ব্রণ সারানো সময় সাপেক্ষ ব্যাপার, ধৈর্যসহকারে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা নেয়াই মঙ্গল। অন্যথায় মুখে ব্রণের কালো দাগ ও গর্তের দাগ বসে যাবে। ব্রণের চিকিৎসা নির্ভর করে ব্রণের অবস্থার উপর। চিকিৎসার পাশাপাশি কিছু উপদেশও মানতে হয়। চিকিৎসা নিতে হয় ধৈর্য সহকারে। পর্যায়ক্রমে ধাপেধাপে ব্রণের চিকিৎসা নেয়া লাগতে পারে। হঠাৎ করে ব্রণ সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। চর্ম বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানেই ব্রণের চিকিৎসা করানো বাঞ্ছনীয়।

সামান্য ব্রণ

❒ অনেকের মুখে ছোট ছোট কিছু দানার মত ওঠে, যা পেঁকে গিয়ে বা চাপ দিলে সাদা শাঁসের মত বের হয়। এক সময়ে চলে যায়। এ অবস্থায় করণীয় কী?

● এটি এক ধরনের ব্রণ। এ ক্ষেত্রে রেটিন-এ ক্রীম (.০৫%) শুধুরাতে দানার উপর লাগিয়ে দিতে

হবে। ক্রিমটি ব্যবহারে ত্বক সামান্য লালাভ হয়ে জ্বলতে পারে। তবে খুব বেশি অসুবিধা হলে ধুয়ে ফেলতে হবে এবং পরবর্তীতে অল্প সময়ের জন্য ব্যবহার করতে হবে। এই ক্রীম দিনের বেলা ব্যবহার করা যায় না। দিনে ব্যবহার করলে সূর্য রশ্মির সঙ্গে বিক্রিয়ায় ত্বক কালো করে দিতে পারে। এই ক্রিম নিয়মিত ব্যবহার করে যেতে হবে। ব্রণ উঠলেই দানার উপর এটি ব্যবহার করতে হবে। আর সকালে মুখ ধুয়ে ফেলতে হবে। মুখ তৈলাক্ত হওয়ার জন্য ব্রণ হয়। তাই দিনে ২/৩ বার 'ডোভ সাদা সাবান দিয়ে মুখ ধুতে হবে। ব্রণ খোঁটা যাবেনা, খুঁটলে দাগ বসে যাবে। দিনের বেলা মুখে কোলোজেন ইলাস্টিন/ভিটামিন-ই ক্রিম মাখা যেতে পারে। এভাবে নিয়ম মেনে চললে এক সময় ব্রণ সেরে যাবে।

বড় আকারে ব্রণ

❒ কারো কারো ক্ষেত্রে ব্রণ বড় আকারে হয়ে থাকে তখন তা দেখতে ছোট ফোঁড়ার মত মনে হয়। এই সব ব্রণের ক্ষেত্রে করনীয় কী ?

● এই ধরনের ব্রণে রাতের বেলা রেটিন এ ক্রিম (০.০৫%) লাগানো যেতে পারে। এতে ও ব্রণের শাঁস বের না হলে তখন একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে, চর্ম বিশেষজ্ঞ ব্রণের শাল বের করে দিবেন। তবে ব্রণ টিপে বা খুঁটে শাঁস বের করতে যাওয়া ঠিক নয় তাতে দাগ হবে। বিশেষ যন্ত্র ছাড়া ক্রায়োসার্জারি করে ব্রণের শাসঁ বের করা যায় এবং দাগ প্রতিরোধ করা যায়। এজন্য অবশ্যই চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। মনে রাখতে হবে ব্রণ যত জটিলই হোক চর্ম বিশেষজ্ঞ ছাড়া এটি নিরাময়ে আর কেউ কার্যকরীভাবে সাহায্য করতে পারবেন না।

ব্রণ ও বিউটি পার্লার

❒ ব্রণের চিকিৎসার জন্য বিউটি পার্লার সহ অনেক জায়গাতেই গ্যারান্টি দেয়া হয়। আসলে কি ওরা দ্রুত ব্রণ সারাতে পারে ?

● এক্ষেত্রে যত গ্যারান্টি দেয়া হবে বুঝতে হবে তাতে ক্ষতির পরিমাণ ততবেশি। চিকিৎসা কখনো গ্যারান্টি দিয়ে হয় না। একমাত্র মূর্খরাই গ্যারান্টি দিতে পারে। বিউটি পার্লারে অতি মাত্রায় পিলিং এজেন্ট সহযোগে মুখে প্যাক দিয়ে ব্রণের মুখ ফাটিয়ে দেয়। এভাবে দ্রুত ব্রণের মুখে ফাটিয়ে শাঁস বের করা মোটেই চিকিৎসা সম্মত নয়। এতে ত্বকের ক্ষতি হয়।

তৈলাক্ত মুখ ও ব্রণ

❒ অনেকেরই মুখ তৈলাক্ত ও মুখে ব্রণও রয়েছে। মুখের তৈলাক্ততার সঙ্গে ব্রণের কোন সম্পর্ক আছে কি ?

● হ্যাঁ মুখ তৈলাক্ত হওয়ার জন্যেই ব্রণ হয়। কাজেই এক্ষেত্রে মুখ ডোভ সাবান (সাদা) দিয়ে দিনে ২/৩ বার ধুয়ে দিতে হবে।

মুখে শাল

❒ কারো কারো ঠোঁটের নিচে, খুতনির উপরে, নাকের উপর কালো গভীর দাগ দেখা যায়। মাঝে মধ্যে তা চুলকায় টিপ দিলে শাল বের হয়। এর সামাধান কী ?

- এ ধরনের দাগের জন্যে Retin-A cream (.05%) ব্যবহার করা যেতে পারে। ক্রিমটি সবসময় রাতে মাখতে হবে। দিনের বেলা কখনোই তা মাখা যাবে না। ক্রিমটি ১ দিন পর পর ১ বার মাখতে হবে এবং তা কেবল কালো দাগের উপরেই মাখতে হবে। কয়েক মাস ব্যবহারে উপকার পাওয়া যাবে। এই ওষুধটি ব্যবহারে সামান্য শুকনো চামড়া খোসা আকারে উঠতে পারে, তবে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। ক্রিমটি ব্যবহারে ত্বক খুব বেশি লাল হলে ব্যবহার বন্ধ করে দিতে হবে।

ব্ল্যাক হেড

❒ অনেকের নাকে ছোট ছোট লোমের মত হয়। এগুলো টিপ দিলে শাঁস বের হয় আসে। এ সমস্যার সমাধান কী ?

- এ জাতীয় সমস্যাকে 'ব্ল্যাক হেড' বলে। এগুলো টিপে শাঁস বের করা উচিত নয়। এতে একটা পর্যায়ে নাক মোটা হয়ে যাবে। যেহেতু নাক মোটা হওয়ার বিষয়টি ধীরে ধীরে হয় তাই বোঝা যায় না। এজন্য রেটিন-এ ক্রিম (০.০৫%) রাতে ১ বার গোটার উপর লাগাতে হবে। লাগানোর ১ ঘন্টা পর ধুয়ে ফেলতে হবে। ক্রিমটি লাগানোর ফলে ত্বক বেশি লাল হওয়া, বেশি চুলকানো, খুববেশি চামড়া ওঠা ইত্যাদি দেখা দিলে ২/৩ দিন পর পর ব্যবহার করতে হবে। এভাবে দীর্ঘ দিন ব্যবহারে ব্ল্যাক হেড সেরে যায়। তবে চর্ম বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে চিকিৎসা নেয়া ভাল।

ব্রণ ও খাবার

❒ অনেকের ধারনা চকলেট, ভাজা পোড়া ও তৈলাক্ত খাবার খেলে ব্রণ হয়। আসলেই কি তাই ?

- ব্রণ হওয়ার সঙ্গে খাবার দাবারের কোন সম্পর্ক নেই। এটা ত্বকের স্থানীয় সমস্যা। কখনো কখনো হরমোনের প্রভাবে হয়ে থাকে।

যৌবনের সমস্যা ব্রণ

ব্রণ যৌবনের অবাঞ্ছিত সমস্যা। সুন্দর মুখশ্রীর উপর জাপটে বসে থাকে গোটার মতো দৃষ্টিকটু যন্ত্রণা। আর তাই ব্রণ নিয়ে ছেলে কি মেয়ে কারোরই চিন্তার শেষ নেই।

কাদের হয়

তেরো বছর বয়স থেকে উনিশ বছর বয়স পর্যন্ত শতকরা নব্বই জনেরই এ রোগটি কম বেশি হয়ে থাকে। বিশ বছর বয়সের পর থেকে নিজে থেকেই এ রোগটি ভাল হয়ে যেতে থাকে। তবে এর ব্যতিক্রম যে হয় না তা নয়। কখনও কখনও বিশ থেকে তিরিশ বছর বয়সেও এটি দেখা দিতে পারে এবং অনেক বছর বয়স পর্যন্ত স্থায়ী হতে পারে।

দেখতে কেমন

ব্রণের প্রকারভেদ অনেক। তবে সাধারণভাবে যে কয়েক ধরনের ব্রণ হয়ে থাকে তারই বর্ণনা এখানে দেখা হচ্ছে।

এটি লোমের গোড়ায় হয়ে থাকে। ব্রণের মূল যে জিনিস, তার নাম কমেডো (চাপ দিলে ভাতের দানার মতো বের হয়)। তবে কখনও কখনও শুধু দানা আকারে, পুঁজ সহকারে, গহ্বরযুক্ত দানা বা বড় গোটার আকারে দেখা দিতে পারে।

শরীরে কোথায় কোথায় হয়

সাধারণত মুখেই (গাল, নাক, কপাল, থুতনি) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে দেখা দেয়। তাছাড়া ঘাড়, শরীরের উপরের অংশ, হাতের উপরের অংশ ইত্যাদি স্থানেও ব্রণ হয়ে থাকে।

কেন হয়

অনেক কারণের ভিতর বংশগত কারণ একটি অন্যতম কারণ।

প্রোপাইনি ব্যাকটেরিয়াম একনিস নামক এক ধরনের জীবাণু স্বাভাবিকভাবেই লোমের গোড়াতে থাকে। এন্ড্রোজেন হরমোনের প্রভাবে সেবাম-এর নিঃসরণ (মাথা, মুখ ইত্যাদি জায়গায় তেলতেলে ভাব) বেড়ে যায় এবং লোমের গোড়াতে উপস্থিত জীবাণু সেবাম থেকে ফ্রী ফ্রাটি এসিড তৈরি করে। এসিডের কারণে লোমের গোড়াতে প্রদাহের সৃষ্টি হয় এবং লোমের গোড়াতে কেরাটিন জমা হতে থাকে।

বিভিন্ন অবস্থায় ব্রণ

ট্রপিক্যাল এক্‌নি-অতিরিক্ত গরম এবং বাতাসের আর্দ্রতা বেশি হলে পিঠে উরুতে-ব্রণ হয়ে থাকে।

প্রিমিন্সট্রুয়াল এক্‌নি-কোন কোন মহিলার মাসিকের সপ্তহখানেক আগে ৫-১০টির মতো ব্রণ মুখে দেখা দেয়।

এক্‌নি কসমেটিকা-কোন কোন প্রসাধনী লাগাতার ব্যবহারে মুখে অল্প পরিমাণে ব্রণ হয়ে থাকে।

এক্‌নি ডিটারজিকেনস্ –মুখে অতিরিক্তভাবে সাবান দিয়ে ধুলেও দৈনিক ১/২ বারের বেশি) ব্রণের পরিমাণ বেড়ে যায়।

স্টেরয়েড এক্‌নি–স্টেরয়েড ওষুধ সেবনে হঠাৎ করে ব্রণ দেখা দেয়। মুখে ষ্টেরয়েড যেমন- বেটনোভেট, ডার্মোভেট জাতীয় ওষুধ একাধারে অনেকদিন ব্যবহারে ব্রণের পরিমাণ বেড়ে যায়।

চিকিৎসা

চিকিৎসা ব্যবস্থা ব্রণের প্রকারভেদের ওপর নির্ভর করে। ব্রণের পরিমাণ যদি খুব বেশি হয় ও ইনফেকশন থাকে তবে টেট্রাসাইক্লিন বা ইরাইথ্রোমাইসিন খেতে হয়। পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আছে বলে এসব ওষুধ একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে খাওয়াই মঙ্গল। তবে সাধারণভাবে রেটিন-এ ক্রিম অথবা পেনক্সিল ২.৫% জেলটি নিরাপদে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি সূর্য ডোবার পর (সন্ধ্যার পর) শুধু গোটাগুলোতে ১/২ বার লাগাতে হয়। এটি লাগালে প্রথম প্রথম একটু চুলকানো বা লালভাব হতে পারে। ২/১ দিন ব্যবহারের পর ঠিক হয়ে যায়। লালভাব বা এলার্জি যদি খুব বেশি হয় তবে ব্যবহার বন্ধ করে দেবেন।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

মেয়েদের গোঁফের রেখা এবং ব্লিচিং

❒ অনেকেরই ঠোঁটের উপরিভাগে লোম ওঠে। ব্লিচিং করে কি এই লোম স্থায়ী ভাবে দূর করা যায় ? এই লোম দূর করার কোনো স্থায়ী পদ্ধতি আছে কি ?

● ব্লিচিং করে ঠোঁটের লোম কালো থেকে হালকা সোনালী করা যায়। এটি সাময়িক। এই হালকা রংয়ের জন্যই সেটা ত্বকের রংয়ের সঙ্গে মিশে থাকে। ইলেকট্রোইপিলিয়েশন হচ্ছে লোম দূর করার স্থায়ী পদ্ধতি। চর্ম বিশেষজ্ঞরা সেটা করে থাকেন।

মেয়েদের গোঁফের রেখা দূর করতে থ্রেডিং কি কাজে আসে ?

❒ মহিলাদের অপ্রয়োজনীয় পশম বিশেষ করে গোঁফের রেখা দেখা দিলে সেগুলো ইলেকট্রোইপিলিয়েশন পদ্ধতিতে তুলে ফেলার পর কি আবারও দেখা দেবে ?

● না, পুনরায় এ পশম গজাবেনা। এ জাতীয় পদ্ধতিতে স্থায়ীভাবে পশম নির্মূল হয়। কিন্তু 'থ্রেডিং' পদ্ধতিতে লোম তুলে ফেলার পরও সেটা আবার গজাবে। থ্রেডিং হয় বিউটি পার্লারে, এটি অস্থায়ী ব্যবস্থা। আর ইপিলিয়েশন পদ্ধতিতে চিকিৎসা করেন কোন চর্ম বিশেষজ্ঞ। থ্রেডিং এবং ইলেকট্রোইপিলিয়েশনের মধ্যে অনেক তফাৎ।

মেয়েদের মুখের লোম দূর করতে আধুনিক পদ্ধতি

❒ অনেক মেয়ে মুখে পুরুষদের মতো মোটা পশমের সমস্যায় ভোগেন। এর সমাধান কি এবং ঘরে বসে স্থায়ীভাবে এগুলো দূর করার কোন ব্যবস্থা আছে কি ?

● বাংলাদেশে মেয়েদের অপ্রয়োজনীয় পশম স্থায়ীভাবে একমাত্র ইলেকট্রো-ইপিলিয়েশন পদ্ধতিতেই নির্মূল করা হয়ে থাকে। উন্নত বিশ্বে এখন লেজার ইপিলিয়েশন পদ্ধতিও চালু রয়েছে। তবে ঘরে বসে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এটি একটি সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। প্রতিবার ৩০-৪০টি পশম তোলা সম্ভব হয়, সময় লাগে প্রায় আধা ঘন্টার মতো। সপ্তাহে বড় জোর ২ বার এটি করা সম্ভব হয়। তবে খরচ সাধ্যের মধ্যে।

ঘরে বসে স্থায়ীভাবে লোম নির্মূল কি সম্ভব ?

❒ যে সব মেয়েদের ঠোঁটের উপরে, গলায় কিংবা মুখে অবাঞ্ছিত লোম রয়েছে তারা কি ঘরে বসে ইলেকট্রোইপিলিয়েশন পদ্ধতিতে নিজেরাই নিজেদের লোম স্থায়ীভাবে নির্মূল করতে পারেন ?

● এ ধরনের অবাঞ্ছিত লোম ঘরে বসে নিজে নিজে শত চেষ্টা করেও স্থায়ীভাবে দূর করা সম্ভব নয়। স্থায়ীভাবে লোম নির্মূলের জন্যে যে ইলেকট্রোইপিলিয়েশন পদ্ধতি

অবলম্বন করা হয় সেই যন্ত্রপাতি কিনে নিজে তা করা সম্ভব নয়। এটি করার জন্যে যন্ত্রপাতি সহযোগে এ বিষয়ে চর্ম বিশেষজ্ঞের অভিজ্ঞতা প্রসূত দক্ষতা প্রয়োজন অর্থাৎ কাজটি করে থাকেন এ বিষয়ে দক্ষ চর্ম বিশেষজ্ঞ। কাজেই চর্ম বিশেষজ্ঞের সাথে পরামর্শ করতে হবে।

মেয়েদের মুখে অবাঞ্ছিত লোম

❐ অনেক মেয়ের মুখমন্ডলে কিংবা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় অবাঞ্ছিত লোম গঁজিয়ে থাকে। বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়ে হরমোনের কোনো সমস্যা ধরা পড়েনা। এ অবস্থায় কী করণীয় ?

● শরীরের অপ্রয়োজনীয় লোমকে ইলেকট্রিক মেশিনের সাহায্যে স্থায়ীভাবে নির্মূল করা যায়। এ পদ্ধতিটির নাম ইলেকট্রোইপিলিয়েশন (Electro epilation)। লোম নাশক লোশন মেখেও লোম অস্থায়ীভাবে নির্মূল সম্ভব। কিন্তু এ ধরনের লোশনে এলার্জি দেখা দিতে পারে বিধায় ইলেকট্রোইপিলিয়েশনই সর্বোত্তম ব্যবস্থা। এ কাজটি চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ করে থাকেন।

মুখে জন্মদাগ

❐ অনেকের মুখমন্ডলে জন্মদাগ থাকে। চিকিৎসা না করালে তা ধীরে ধীরে বড় হয়ে সমস্ত মুখ মন্ডলে ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা থাকে কি ?

● না, এ জাতীয় কোনো সম্ভাবনা থাকেনা। তবে সময়ের সাথে সাথে যেমন মুখমণ্ডল বড় হতে থাকে তেমনি জন্মদাগটিও আকারে একটু বড় হবে কিন্তু পুরো মুখে তা ছড়িয়ে পড়ার সম্ভাবনা নেই।

মুখে হলুদ ও লেবুর রস

❐ প্রতিদিন মুখে হলুদ এবং লেবুর রস মাখাতে কি ত্বক ফর্সা হয় ?

● গায়ের রং কি রকম হবে তা নির্ভর করে ত্বকে মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থের উপস্থিতির উপর। যার শরীরে মেলানিন যত বেশি তার রং তত গাঢ়। শেতাঙ্গদের শরীরে মেলানিন কম থাকে। সুতরাং মুখে ও শরীরে কোনো কিছু মেখে ফর্সা হওয়া যাবেনা। হলুদ বা লেবুর রস মাখায় সাথেও এর কোনো সম্পর্ক নেই।

মুখের ত্বক শুষ্ক

❐ কারো কারো মুখের ত্বক ভীষণ শুষ্ক ও রুক্ষ হয়। কোন্ সাবান ব্যবহার করলে মুখের এই রুক্ষ ভাব কমবে ?

● শুষ্ক ত্বকে সাধারণ সাবান ব্যবহার না করাই ভালো। যদি সাবান ব্যবহার করতেই হয় তবে oilatum soap কিংবা Dove soap অথবা যেকোনো গ্লিসারিন সাবান ব্যবহার করা যেতে পরে। মুখ ধোয়া বা গোসলের পর গরমকালে ভিটামিন-ই এবং শীত কালে ময়েশ্চারাইজার সমৃদ্ধ ক্রীম ব্যবহার করা যেতে পারে। এতেও কাজ না হলে ত্বক সুগন্ধিহীন ভ্যাসিলিন লাগানো যেতে পারে।

- এমন অনেকেই আছেন যাদের শরীরের বিভিন্নস্থানে বেশ কিছু আঁচিল রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের বিকল্প চিকিৎসা গ্রহণেও সেরে উঠছে না এক্ষেত্রে করণীয় কী ?
- এক্ষেত্রে ইলেকট্রোকটারী করে আঁচিল নির্মূল করা যায়। চর্মরোগ বিশেষজ্ঞরা এই কাজটি করে থাকেন। মুখে আঁচিল হলেও এই পদ্ধতিতে ব্যবস্থা নেয়া যায়। এটি একটি ব্যথা মুক্ত পদ্ধতি।

আঁচিল সম্পর্কে বিস্তারিত

আঁচিল সম্বন্ধে সাধারণ মনে একটি ভুল ধারণা আছে। তা হচ্ছে যে, এর কোন চিকিৎসা (এলোপ্যাথিক) নেই এবং এটি এলোপ্যাথিক ছাড়া অন্যসব চিকিৎসা ব্যবস্থায় ভাল হয়। এ ধারণাটি যারা পোষণ করেন তাদের সঠিক তথ্য জানিয়ে দেয়ার জন্যই এ লেখা। আঁচিল বলতে সাধারণ মানুষ যা বোঝেন তার বিভিন্ন প্রকারভেদ আছে। তবে প্রকারভেদ যাই হোক না কেন, এটি কখনও কখনও নিজে থেকেই ভাল হয়ে যায়। আর নিজে থেকে ভাল হয়ে যাওয়ার কারণে অনেকে এলাপ্যাথ চিকিৎসা নেয়া থেকে বিরত থাকেন। এই ভুল ধারণা থেকে চিকিৎসা না নেয়ার কারণে কখনও কখনও এমন ভয়াবহ অবস্থা দাঁড়ায় যে অন্যান্য চিকিৎসা ব্যবস্থা তো দূরের কথা এলোপ্যাথ চিকিৎসকদেরই হিমশিম খেতে হয় এবং কখনও কখনও চিকিৎসা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। আঁচিলের একটি প্রকারভেদকে ইংরেজীতে বলা হয় মোলাস্কাম কনটাজিওসাম। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এটি একটি ছোঁয়াচে অসুখ।

এটি সংখ্যায় সাধারণত একটি বা কখনও কখনও অনেক হতে পারে।

এটি দেখতে গোলাকার; দু থেকে পাঁচ মি.মি. ব্যাসার্ধের; সাদা অথবা গোলাপী রং বিশিষ্ট; শক্ত এবং মোমের মতো স্বচ্ছ আবরণযুক্ত এবং মাঝখানে সুন্দর একটি গর্ত থাকে।

আক্রান্ত স্থান সাধারণত মুখ, হাত, তলপেট এবং যৌনাঙ্গ। তবে ঠোঁট, জিহবা, এমনকি মুখের ভিতরও হয়ে থাকে। এ অসুখটি ভাইরাস দ্বারা হয়ে থাকে। ভাইরাসটি পক্স ভাইরাস গ্রুপের। স্কুলে যায় এমন বয়সের বাচ্চাদের অসুখটি বেশি দেখা যায়। শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকলে এ অসুখে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা বেশি থাকে। চিকিৎসার ক্ষেত্রে যে বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হচ্ছে যে এটি নিজে থেকেই বিনা ওষুধ প্রয়োগে ভাল হয়ে যায়। সংখ্যা খুব বেশি হলে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলার জন্য গ্রাইসোফুলভিন নামক ওষুধটি নির্দিষ্ট পরিমাণে খাওয়ানো যেতে পারে যা কিনা একজন চিকিৎসকের অধীনে হওয়াই মঙ্গল। তবে তাৎক্ষণিকভাবে সারিয়ে তোলার জন্য অনেক ধরনের সার্জিক্যাল ব্যবস্থা নেয়া যায়। যেমন কিউরেট করা বা চেছে ভিতরের জীবাণু বের করে ফেলা। আঁচিলের আরেকটি প্রকারভেদকে ইংরেজীতে বলে ওয়ার্টস বা ভেরুকা। এটিও একটি ছোঁয়াচে অসুখ এবং সংখ্যায় সাধারণত একটি বা কখনও কখনও অনেক হতে পারে। দেখতে এটি গোলাকার। তবে বাহিরের আবরণটি এক্ষেত্রে অস্বচ্ছ (Rough)। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে এর আকৃতি বিভিন্ন ধরনের

হয়ে থাকে। সাধারণত বাচ্চাদের এটি হয়ে থাকে এবং সংখ্যায় অনেক হয়। তবে বড়দের ক্ষেত্রে যখন হয় তখন সংখ্যায় দু'টি বা তিনটির মতো হয়।

আক্রান্ত স্থান সাধারণত হাত। তবে এর বিপজ্জনক দিক হচ্ছে শরীরের যে কোন স্থানে হয়ে থাকে। নাকে, কান বা মুখের ভিতর যখন হয় তখন চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব জটিল হয়ে যায়। হাতে অসুখটি থাকার পর, যাদের দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাস থাকে তাদেরই জিহ্বাতে হয়ে থাকে। তেমনিভাবে নাক ও কানের ভিতরও হয়ে থাকে।

শুরুতে অবশ্য দেখতে এগুলো আলপিনের মাথার সমান স্বচ্ছ আবরণযুক্ত হয়ে থাকে। আস্তে আস্তে যত সময় যেতে থাকে উপরের আবরণটি একটু অস্বচ্ছ (Rough) হয়ে যায়।

এ ধরনের আঁচিলটিও ভাইরাসজনিত অসুখ। ভাইরাসটির নাম হচ্ছে হিউম্যান পেপিলোমা ভাইরাস।

শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ, যেমন–চোখের পাতা, মাথা, মুখ, হাত পা, শরীর এমন কি যৌন অঙ্গেও হয়ে থাকে। যৌনাঙ্গে অসুখটি খুব ভয়াবহ অবস্থা ধারণ করে। যদি প্রথমেই এর চিকিৎসা ব্যবস্থা করানো না হয় তবে পরবর্তীতে ক্রায়োসার্জারি ছাড়া এর চিকিৎসা ব্যবস্থা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যৌনাঙ্গ অনেক দিন আক্রান্ত থাকাতে অনেক সময় অনেক সময় ক্যান্সারে রূপ নিতে পারে। তখন যৌনাঙ্গ কেটে ফেলা ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না।

এ অসুখটিও বিনা চিকিৎসায় ভাল হয়ে যেতে পারে। তবে মলাস্কাম কনটাজিওসাম যত তাড়াতাড়ি নিজে থেকে ভাল হয়ে যায় এ ক্ষেত্রে তা হয় না।

বিভিন্ন ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থার ভিতর অতি দ্রুত সারিয়ে তোলা যায় এমন একটি চিকিৎসা ব্যবস্থার নাম হচ্ছে ইলেক্ট্রোডেসিকেশন। তবে এ জন্য একজন অভিজ্ঞ চিকিৎসকের প্রয়োজন হয়।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

রং ফর্সা করার কোন ক্রীম নেই

❐ কেউ কেউ গায়ের রং ফর্সা করার জন্য তথাকথিত রং ফর্সা করার ক্রিম মেখে থাকেন। এটা কিংবা অন্য কোনো ব্যবহার করে গায়ের রং ফর্সা করা যায় কি ?

● প্রকৃতপক্ষে রং ফর্সাকরার কোন ক্রীম নেই। বাজারে রং ফর্সা করার নামে যেসব ক্রীম পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহারে সাময়িকভাবে ত্বক ফর্সা হলেও তা ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার জন্য হয়ে থাকে। এতে ত্বকের ক্ষতি হয়। এক পর্যায়ে ত্বকে পানি লাগালে জ্বালা করে। রং কখনোই ফর্সা করা যায় না। এটা জন্মগত ব্যাপার। তবে সূর্যের আলো এড়িয়ে চললে ত্বকের রং কিছুটা উজ্জ্বল হয়। কাজেই তথাকথিত রং ফর্সাকারী ক্রিম ব্যবহার করে আর্থিক ও শারীরিকভাবে প্রতারিত হওয়ার মানে হয় না।

রং ফর্সা করার দাবিদার
যেকোন ক্রিম ত্বকের জন্য ক্ষতিকর

কসমেটিকসামগ্রী নিয়ে দেশে এখন যে ধরনের অপপ্রচার চলছে তা বোধহয় পৃথিবীতে আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসব কসমেটিকের মধ্যে তথাকথিত রং ফর্সাকারী কমেপ্লক্সন ক্রিম ও স্পটক্রিম নিয়ে মিথ্যাচার ও প্রতারণা চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। টেলিভিশন খুললেই প্রতিনিয়ত এসব ক্রিমের উদ্ভট অবৈজ্ঞানিক দাবি ও বক্তব্য সংবলিত বিজ্ঞাপনের দাপট চোখে না পড়ার কথা নয়। এসব তথাকথিত রং ফর্সাকারী কমপ্লেক্সন ক্রিম ও স্পট ক্রিমের ভুয়া বিজ্ঞাপনের মিথ্যা আশ্বাসে পড়ে প্রতিদিন লাখ লাখ নারী-পুরুষ প্রতারিত হচ্ছে।

ভৌগালিক অবস্থান এবং বংশগত কারণে আমাদের দেশের অধিকাংশ নারী ও পুরুষের গায়ের রং হালকা বাদামী বর্ণের জন্য বিভিন্ন সামাজিক সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। তাই অনেক বাদামী বর্ণের অর্থাৎ কালো বলে কথিত মেয়েদের মধ্যে ফর্সা হওয়ার একটা সুপ্ত ইচ্ছা দীর্ঘদিন ধরে লালিত হতে থাকে। ফর্সা হওয়ার সেই সুপ্ত ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলছে তথাকথিত কমপ্লেক্সন ক্রিম ও স্পট ক্রিমের ভুয়া বিজ্ঞাপন। রং ফর্সা করার জন্য এ দেশের মানুষে আগ্রহ এতটাই বেশি যে চিকিৎসকদের সতর্কবাণী তাদেরকে তথাকথিত রং ফর্সাকারী ক্রিম থেকে দূরে রাখতে পারছে না। রেডিও টেলিভিশনে রং ফর্সাকারী ও যে কোন দাগ দূর করার মিথ্যা প্রতিশ্রুতির চটকদার বিজ্ঞাপনের ফাঁদে পড়ে লাখ লাখ মেয়ে প্রতারিত হচ্ছে এবং রং ফর্সা হওয়া কিংবা দাগ দূর হওয়ার পরিবর্তে অনেকেই উল্টা এসব ক্রিমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াজনিত সমস্যায় আক্রান্ত হয়ে শারীরিক ক্ষতিকে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছে।

পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন কসমেটিকের কন্টেনার ও মোড়াকের গায়ে তার মধ্যে কি কি উপাদান আছে তা লিখে দেয়ার নিয়ম চালু রয়েছে। এত করে কসমেটিকের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা খুব সহজেই অনুমান করা যায়। অথচ অবাক ব্যাপার হচ্ছে, কমপ্লেক্সন ও স্পটক্রিমের প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির তিনি নিজেই তাঁর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রস্তুকৃত ক্রিমে কী উপাদান আছে তা জানেন না।

প্রকৃতপক্ষে লাবণ্যময় ত্বক মানেই সুন্দর ত্বক। অপুষ্টি ও অযত্নের কারণে অনেক সময় ত্বক মলিন হয়ে সৌন্দর্য হানি ঘটায়। কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, রোদ এড়িয়ে চলা, ভিটামিনসমৃদ্ধ শাকসবজি, তাজা ফল ও ফলের রস খাদ্যের মাধ্যমেই ত্বকের হারানো লাবণ্য ফিরে পাওয়া যেতে পারে। তবে তথাকথিত রং ফর্সাকারী ক্রিমের কোন ভূমিকা নেই। এছাড়া পৃথিবীর কোথাও রং ফর্সাকারী ক্রিম বলতে কোন কিছু আজও উদ্ভাবিত হয়নি। অথচ রং ফর্সাকারী অতিপরিচিত কমপ্লেক্সন ক্রীমের প্যাকেটের মধ্যে একটি লিফলেটের শিরোনামে 'বাংলাদেশে এই প্রথম এক আশ্চর্য্য রং ফর্সাকারী ক্রীম' এই কথাটি লিখে চরম মিথ্যাচার করেছে। এসব ক্রিমকে কেন রং ফর্সাকারী ক্রিম বলে প্রচার করা হচ্ছে এই প্রশ্নের জবাবে একটি কর্তৃপক্ষ এটিকে ব্যবসায়িক কৌশল বলে অভিহিত করে বলেন–'এটি বিজনেস স্ট্রেটিজি, এটা না লিখলেতো লোকে কিনবে না'। শুধু ফর্সা করাই নয়, একাধারে ব্রণ, মেছতা, ছুলি কালোদাগ দূর করা, মেকআপের ফাউন্ডেশন

হিসাবে, শেভের পর এন্টিসেপটিক ক্রিম হিসাবে বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে কাজ করে এমন উদ্ভট দাবী অতি পরিচিত একটি কমপ্লেক্সন ক্রিমের ইনার লিফলেটে উল্লেখ রয়েছে। একটি ক্রিম কিভাবে এত চর্ম রোগে কাজ করে, এ বিষয়ে বিষ্মিত হয়ে বলেন-এটা কীভাবে সম্ভব। একটি ক্রিম দিয়ে যদি মেছতা এবং কালো দাগ দূর করার কথা বলা হতো তাহলেও মেনে নেয়া যেত। কিন্তু ব্রণ ও ছুলি সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন অসুখ। একটি ক্রিমে কিভাবে এত চর্মরোগ সারে তা বিশেষজ্ঞদের কাছে বোধগম্য নয়।

এই প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটির চর্মরোগ বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ডাঃ এজেডএম মাঈদুল ইসলাম বলেছেন-ব্রণ, মেছতা, ছুলি কালো দাগ, এ্সব রোগের কারণ, রোগের প্যাথজেনেসিস বা রোগাক্রান্ত করার প্রক্রিয়া এবং চিকিৎসা আলাদা আলাদা। মেছতার ত্বকে কালোদাগ পড়ে আর ছুলিতে সাদা দাগ পড়ে। দুইটি বিপরীত ধর্মী ত্বকের উপসর্গে চিকিৎসার লক্ষ বিপরীত ধর্মী হওয়া উচিত। ধরে নিলাম রং ফর্সাকারী কমপ্লেক্সন ক্রিমটি মেছতার কালো দাগ দূর করে, তাহলে এটিতে ছুলির সাদা দাগকে আরো সাদা করার কথা যা কারো কাম্য নয়। একটি ক্রিমে এতগুলো চর্মরোগ সারানোর দাবিকে তিনি উদ্ভট ও অবৈজ্ঞানিক বলে অভিহিত করেছেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন–ব্রণ, মেছতা, ছুলি কিংবা ত্বকের যে কোন কালো দাগ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ডারমাটেলজির আওতাধীন রোগ। এসব চর্মরোগের ভাল চিকিৎসাও রয়েছে। অথচ রং ফর্সাকারী ফেয়ারনেস ক্রিম, কমপ্লেক্সন ক্রিম ও স্পট ক্রিমের নামে কিছু অসাধু প্রতিষ্ঠান মানুষকে স্রেফ মিথ্যা কথা বলে ব্যবসায়িক ফয়দা লুটছে। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে ক্রিমটি ব্রণ, মেছতা, ছুলি ও কালো দাগ দূর করার কাজে ব্যবহৃত হবে তখন আর তাকে প্রসাধন বলা যাবে না। তখন তাকে ওষুধ বলে গণ্য করতে হবে এবং বাজারজাত করার আগে ওষুধ প্রশাসনের ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। কোন প্রসাধনের মাধ্যমে এত চর্মরোগ সারিয়ে তোলার দাবি ভিত্তিহীন ও অবৈজ্ঞানিক। এসব ভুয়া ক্রিম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই বলেই মিথ্যা বিজ্ঞাপন টেলিভিশন, রেডিও ও পত্রপত্রিকায় আসছে এবং সাধারণ মানুষ তা বিশ্বাস করে যার পরনাই ঠকছে।

সরকার নিয়ন্ত্রিত বিএসটিআই-এর একটি কসমেটিক ডিভিশন রয়েছে। এ প্রতিষ্ঠান কোন কসমেটিকে কি কি উপাদান আছে তা পণ্যের মোড়কে ও কন্টেনারের গায়ে উল্লেখ করার নিয়ম চালু তো দূরে থাক, কসমেটিকের মোড়কের গায়ে প্রস্তুতের তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ লেখার সাধারণ নিয়মটি পর্যন্ত অদ্যাবধি বিএসটিআই, চালু করতে পারেনি।

অন্যদিকে রেডিও টেলিভিশনে বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যাপারে একটি সুস্পষ্ট নীতিমালা রয়েছে যার আওতায় সিগারেট ও ওষুধের বিজ্ঞাপন সেখানে প্রচার করা যায় না। কিন্তু কঠোর নিয়মের ফাঁক গলে এসব ভুয়া অবাস্তব, অবৈজ্ঞানিক ও জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতির রং ফর্সাকারী ক্রিমের বিজ্ঞাপন কিভাবে প্রচার হচ্ছে তা বোধগম্য নয়, জনস্বাস্থ্যের স্বার্থে এসব রং ফর্সাকারী ক্রিমের বিজ্ঞাপন অচিরেই বন্ধ হওয়া উচিত।

অধ্যাপক ডাঃ মাঈদুল ইসলামের মতে কসমেটিক ক্রিম প্রস্তুকারী প্রতিষ্ঠান বিএসটিআই'কে এটাই বোঝাতে সমর্থ হয়েছে যে, পণ্যের গায়ে মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ

লেখা থাকলে অনেক পণ্য অবিক্রীত থেকে যেতে পারে। এতে করে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক ক্ষতি হবে। বিএসটিআই মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য ব্যবহারে ভোক্তাদের শারীরিক ক্ষতির কথাটি বিবেচনা না করে প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সুবিধার কথা বিবেচনা করেছে।

শুধু রং ফর্সাকারী কমপ্লেক্সন ক্রীম কিংবা স্পট ক্রিমই নয় যে কোন ক্রিম বাজারজাত করার আগে নিশ্চিতভাবে জানতে হবে সেই ক্রিমে কি কি সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় উপাদান কি অনুপাতে রয়েছে। তারপর কেমিষ্ট, ফার্মাসিষ্ট বিশেষজ্ঞ ডার্মাটোলজিষ্ট-এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটির তত্ত্বধানে হিউম্যান ট্রায়াল-এর পর অনুমোদন পেলেই সেটা বাজারজাত হবে, নতুবা নয়। পণ্যের গায়ে লেখা থাকতে হবে উৎপাদনেরর তারিখ ও মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ। কিন্তু আমাদের দেশে কসমেটিক উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান পণ্যের উপাদান উৎপাদন তারিখ ও মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখ উল্লেখের ব্যাপারে ভোক্তাদের অন্ধকারে রাখছেন।

এ বিষয়ে সরকারের নিক্রিয়তার কারণে কসমেটিক প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এই সুযোগটি পাচ্ছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক ডাঃ এজেডএম মাঈদুল ইসলাম বলেন -এক সময় তিনিও বিএসটিআই-এর কসমেটিক ডিভিশনের সদস্য ছিলেন তখন তিনি তথাকথিত রং ফর্সাকারী ও স্পট ক্রিমসহ যে কোন কসমেটিক বাজারজাত করার আগে পণ্যের উপাদান উল্লেখ, মেয়াদউর্ত্তীণের সময়সীমা উল্লেখ ও হিউম্যান টেষ্ট ইত্যাদি ওপর ভিত্তি করে নীতিমালা তৈরির প্রস্তাব দিয়েছিলেন কিন্তু এরপর আর তাকে ডাকা হয়নি। মানুষের শরীরের রং জন্মগতভাবে নির্ধারিত হয়। সেই রঙকে কোনভাবেই ফর্সা করা সম্ভব নয়। একজন ফর্সা ইউরোপিয়ান সারাজীবন বাংলাদেশে থাকলেও তিনি যেমন বাঙালীর বাদামী রং পাবেন না তেমনি একজন বাংলাদেশী সারাজীবন ইউরোপে থেকে তার রং ইউরোপীয়দের মতো ফর্সা করতে পারবেন না। তবে সূর্যালোকের প্রভাবে ত্বকের রং সাময়িকভাবে কিছুটা গাঢ় বর্ণের হয়ে যেতে পারে।

সূর্যরশ্মি এড়িয়ে চলার মাধ্যমেই এ ক্ষেত্রে পূর্বের রং ফিরে পাওয়া সম্ভব। সূর্যরশ্মি এড়ানো সম্ভব না হলে এ ক্ষেত্রে প্রতি ৩ ঘন্টা অন্তর সানক্রীন ক্রিম/লোশন বাবহার করা যেতে পারে। এত রং ফর্সা হবে না কিন্তু যা ছিল তাই থাকবে। এই ফলাফল লাভের জন্য সানক্রীনের একক-সানপ্রোটেকশন ফ্যাক্টর (এসপিএফ) ন্যূনতম ১৫ হাতে হবে। কিন্তু রং ফর্সাকারী ক্রিম প্রস্তুতকারী একটি প্রতিষ্ঠানের জনৈক কর্মকর্তা তাদের ক্রিমটিতে সানক্রীন রয়েছে বলে জানালেও কি পরিমাণ সানক্রীন রয়েছে তা বলতে পারেননি। উল্লেখ্য, সানস্ক্রীন দিনে ব্যবহার করতে হয়, রাতে ব্যবহার করে লাভ নেই কিন্তু কমপ্লেক্সন ক্রিমের ব্যবহার বিধিতে ক্রিমটিকে রাতে ব্যবহার করতে বলা হয়। যা হাস্যকরও বটে, তাছাড়া এসব রং ফর্সাকারী ক্রিমের কোনটিতে সানস্ক্রীন রয়েছে বলে মোড়কে উল্লেখ নেই। রং ফর্সাকারী এসব ক্রিমের একটি বিজ্ঞাপনে উল্লেখ রয়েছে-এগুলো ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে "মেলানিন"কে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু মেলানিন নিয়ন্ত্রণকারী ক্রিম ত্বকের জন্য ক্ষতিকর, এতে ত্বক আর্দ্রতা ধরে রাখার ক্ষমতা হারায়, যা মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করে। যেহেতু এই ধরনের রং ফর্সাকারী ক্রিমে কি আছে তা কেউই জানে না। তাই এগুলো ব্যবহারে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। রং ফর্সা করার দাবিদার যে কোন ক্রিমই ত্বকের জন্য ক্ষতিকর বলে জানিয়েছেন-অধ্যাপক ডাঃ মাইদুল ইসলাম।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এসব তথাকথিত রং ফর্সাকারী ক্রিম, স্পট ক্রিম ব্যবহারের পর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত বিভিন্ন চর্মরোগের শিকার হয়ে প্রচুর রোগী তাদের চেম্বারে ও হাসপাতালে আসছেন। একই অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেছেন হলিফ্যামিলি হাসপাতালের সিনিয়র কনসালটেন্ট ডার্মাটোলজিস্ট ডাঃ এমইউ কবীর চৌধুরী। ডাঃ কবীর চৌধুরী বলেন, প্রতিদিন যদি তিনি ৪০টা রোগী দেখেন তার মধ্যে ৮-১০ জনই তথাকতিথত রং ফর্সাকারী কমপ্লেক্সন ক্রিম ও স্পট ক্রিমের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াজনিত চর্মরোগের শিকার হয়ে তাঁর কাছে আসেন সুতরাং একজন চর্মবিশেষজ্ঞের কাছ থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকেই বোঝা যায়, এসব রং ফর্সাকারী কমপ্লেক্সন ক্রিম ও স্পট ক্রিম থেকে সাধারণ মানুষ কী ব্যাপকভাবে চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছে।

ব্রণ, মেছতা, ছুলি কালো দাগ দূর করাসহ রং ফর্সা করার কাজে চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনুমোদিত নয়,এমন রাসায়নিক উপাদান হচ্ছে স্টেরয়েড সাময়িকভাবে ষ্টেরয়েড জাতীয় উপাদান কাজ করে কিন্তু কিছুদিন ব্যবহারেই মারাত্মক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

যা থেকে সেরে উঠতে চর্মবিশেষজ্ঞের তত্ত্ববধানে থেকেও বছরখানেকে লেগে যেতে পারে। স্টেরয়েডের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা চিকিৎসা বিজ্ঞানে সর্বজনবিদিত। যেমন - প্রাথমিকভাবে সেরে যাওয়া ব্রণ পুনরায় আরো প্রকট হয়ে ওঠে, মেয়েদের মুখে ছেলেদের মতো পশম গজাতে পারে, মুখে ছেলেদের মতো পশম গজাতে পারে, মুখের ত্বক পাতলা হয়ে রক্তনালী ভেসে গোলাপী আভা ছড়ায়, এক সময় ত্বক কোন ধরনের কসমেটিক সহ্য করতে পারে না, ত্বক জ্বালা করে, চুলকায়। এক পর্যায়ে ত্বকে পানি কিংবা বাতাস লাগালেও জ্বালার অনুভূতি হয়। একমাত্র ভুক্তভোগীই এসব উপসর্গের সঙ্গে পরিচিত। স্টেরয়েড চিকিৎসকের তত্ত্ববধান ছাড়া ব্যবহার নিষিদ্ধ। রং ফর্সা করার জন্য এসব ক্রিমে হাইড্রোকুইনোন কেমিক্যাল থাকে, তবে সে ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট ব্যবহারে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া স্বরূপ ত্বকের কোন কোন অংশ ছাকড়া ছাকড়া ভাবে সাদা হয়ে যায়। যাতে করে এক পর্যায়ে মনে হবে আগের রংই ভাল ছিল।

ফর্সা রঙের প্রতি এ দেশের লোকজন বরাবরই দুর্বল । আর এই দুর্বলতাকে পুঁজি করে প্রসাধনী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠানগুলো রং ফর্সাকারী ক্রিম বাজারে ছেড়েছে। এসব ক্রিমে এখন বাজার সয়লাব। রং ফর্সাকারী ক্রিম প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের দাবী অনুসারে এসব সামগ্রী মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ত্বক আরও ফর্সা ও উজ্জ্বল করে তোলে কিন্তু চর্ম বিশেষজ্ঞরা তাদের এই দাবি প্রত্যাখান করে বলেছে-এটা জনগণকে প্রতারিত করছে এবং চর্মরোগ আক্রান্ত করছে। এ প্রসঙ্গে ভারতের মুলচান্দ হাসপাতালের চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ এএইচ রিজভী এক সাক্ষাতকারে বলেছেন রং ফর্সাকারী রেশির ভাগ ক্রিমের রং উজ্জ্বলকারী পদার্থ হাইড্রোকুইনেন ব্যবহার করা হয়। কিন্তু এর ফলে ত্বকের ক্যান্সার ও লিউকোডারমা রোগ হয় ।

তিনি আরও বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে অনেক আগেই বাংলাদেশে ফর্সাকারী ক্রিম নিয়ে চলছে মিথ্যা প্রচারণা। যার ফলে লাখ লাখ মহিলা আর্থিকভাবে প্রতারিত হচ্ছেন এবং চর্মরোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এই ধরনের ক্রিমের ওপর বিএসটিআই, ওষুধ প্রসাধন, স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়, তথা সরকারের কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকায় ক্রিম ব্যবহারকারীদের অনেক ক্ষতি হচ্ছে।

মেছতার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে ?

● যেহেতু মেছতার কারণ অনেক তাই চিকিৎসা ব্যবস্থা এবং চিকিৎসার স্থায়ীত্বকাল কারণের উপর নির্ভরশীল। তবে সাধারণভাবে হাইড্রোকুইনোন উপাদান সমৃদ্ধ ক্রিম যেমন- এলডোকুইন ৪% দিয়ে কালোদাগ দূর করা যায়। মেছতার কালোদাগ দূর করতে ৬ মাস পর্যন্ত সময় লাগতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এরই মাঝে ওষুধের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে, অর্থাৎ ত্বক ছাকড়া ছাকড়াভাবে অতিরিক্ত সাদা হয়ে যেতে পারে। তবে সবার ক্ষেত্রে এমনটি হয় না। যদি হয় অবশ্যই চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। এছাড়া সূর্যালোকের কারণে মেছতা হয়ে থাকলে সেক্ষেত্রে সানস্ক্রীন ক্রিম ব্যবহার করতে হবে।

মেছতা ও ভুল চিকিৎসা

❒ নারী বা পুরুষ অনেকেই মুখে মেছতার দাগে ভুগে থাকেন। দাগ দূর করার জন্যে কেউ কেউ বেটনোভেট ক্রিম ব্যবহার করেন। মেছতা দূর করার উপায় কী ?

● মেছতার জন্যে একজন চর্মবিশেষজ্ঞের অধীনে চিকিৎসা নেয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। বেটনোভেট মেছতার ওষুধ নয়। বেটনোভেট ব্যবহারে প্রথম প্রথম একটু ভালো ফল পাওয়া গেলেও পরবর্তীতে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলো হচ্ছে –

১। মুখের ত্বক পাতলা হয়ে যাওয়া। যেকোন কসমেটিক ব্যবহারে এলার্জির ভাব হওয়া। জ্বালা পোড়া করা।

২। হঠাৎ মুখে প্রচুর ব্রণ হওয়া।

৩। মহিলাদের ক্ষেত্রে পশম ভেসে ওঠা ইত্যাদি।

দাড়ি স্বল্পতা

❒ কারো কারো কেবল থুতনিতে কয়েকটি দাড়ি। সমস্ত মুখে দাড়ি গজানোর উপায় কী ?

● দাড়ির পরিমাণ কি হবে তা নির্ভর করে বংশগত এবং হরমোনের প্রভাবের উপর। যদি অন্যান্য সেক্সুয়াল

ডেভলপমেন্টে কোনো অসুবিধা না থাকে তাহলে ধরে নিতে হবে এটা বংশগত ব্যাপার। সেক্ষেত্রে এটাকে মেনে নেয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। হরমোন প্রয়োগ করে অনেকে দাড়ি গজানোর ইচ্ছা পোষণ করনে কিন্তু সেটা ক্ষতিকর।

আর্সেনিক দূষিত পানি

❐ যে নলকূপের পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক থাকে সে পানি দিয়ে গোসল, হাতমুখ ধোয়া ইত্যাদিতে কোনো বিষক্রিয়া হবে কি ?

● না, গোসল, হাতমুখ ধোয়াতে এ পানি ব্যবহারে কোনো সমস্যা নেই। শুধু খাওয়া যাবেনা। আরো একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে যে রান্নাবান্নার কাজেও অর্থাৎ যে পানি দিয়ে তরকারী রান্না করা হবে সে পানিতে অতিরিক্ত মাত্রায় আর্সেনিক থাকলে তা রান্নার কাজে ব্যবহার করা যাবে না।

পানিতে অতিরিক্ত আয়রন

❐ অনেক টিউবওয়েলের পানিতে বেশি পরিমাণ আয়রন থাকে। এই আয়রণ শরীরের কোন ক্ষতি করে কী ?

● পানি অতিরিক্ত আয়রন থাকলে তা ত্বক ও চুলের জন্য ক্ষতিকর। এছাড়া সেই পানি খেলে পেটের গোলযোগ ও দাঁতে আয়রণের বাদামী আস্তরণ বা দাগ পড়তে পারে। কাজেই পানিতে অতিরিক্ত আয়রণ থাকলে তা এড়িয়ে চলাই ভাল।

ঘামের দুর্গন্ধ

❐ অনেকের ঘামে দুর্গন্ধ হয়। করণীয় কী ?

● ঘামে দুর্গন্ধ হওয়ার পেছনে ব্যাকটেরিয়ার ভূমিকাই বেশি। এজন্য করণীয় প্রতিদিনের কাপড় প্রতিদিন বদলিয়ে পড়া, প্রতিদিন গোসল করা (দরকার পড়লে ২ বার), বগল শেভ করে রাখা। আন্ডার শেভকরা, ডিওডোরেন্ট ও এন্টিপারস্‌পিরেন্ট ব্যবহার করা, এন্টিব্যাকটেরিয়াল সোপ, যেমন Lever-2000 Soap বা কার্বলিক সোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। এন্টিসেপটিক ক্রিম বগল, কুঁচকি ইত্যাদিতে ব্যবহার করে ব্যাকটেরিয়ার আধিক্য কমানো যায় ও দুর্গন্ধ কমে। তবে এ জাতীয় ক্রীমের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এড়ানো ও ক্রীম নির্বাচনের জন্য চর্মবিশেষজ্ঞের পরার্মশ নিন।

গরমে ঘামাচি

প্রচণ্ড গরমে ঘামাচিতে আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক। গরমকালে কমবেশি অনেকেরই ঘামাচি হয়। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে বৈদ্যুতিক পাখা আজকাল নিম্ন মধ্যবিত্ত পর্যন্ত প্রতিটি বাড়িতেই দেখা যায়। গ্রাম-গঞ্জে বিদ্যুতের সরবরাহ, মোটা সুতির মশারির পরিবর্তে নেটের মশারি, সাবানের ব্যবহার, হালকা পাতলা কাপড়ের প্রচলন ইত্যাদি সব কিছু মিলিয়ে ২০-২৫ বছর পূর্বে মানুষ যে হারে ঘামাচিতে আক্রান্ত হতো এখন আর তা হয় না। আর তাই ঘামাচি কি এবং দেখতে কেমন তা অনেকেই ভুলে গেছেন। ঘামাচি

হলে এখন অনেকে তাকে মারাত্মক চর্মরোগ মনে করছেন। ঘামাচি সম্বন্ধে সঠিক ধারণা দেয়ার জন্যই এই লেখা।

ঘামাচি কি ?

ঘাম তৈরি হওয়ার পর যে সরু নল বা ডাক্ট দিয়ে তা শরীরের বাইরে চলে আসে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঘাম তৈরি হওয়া বন্ধ থাকে না। ফলে ক্রমবর্ধমান ঘামের চাপে সেই নল বা ঘাম তৈরির গ্রন্থিটিই ফেটে যায় এবং ঘাম চামড়ার নিচে জমা হয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে ঘামাচির সৃষ্টি করে। এ জাতীয় সমস্যা সাধারণত গরমকালে হয়ে থাকে, যখন বাতাসের আর্দ্রতা খুব বেশি থাকে।

প্রকারভেদ

মিলিয়ারিয়া ক্রিস্টালিনা ঃ এ ধরনের ঘামাচি দেখতে স্বচ্ছ ছোট ছোট গোলাকার, পানি জাতীয় ফুসকুঁড়ি (ভেসিকল) আকারে দেখা দেয়। এতে কোন উপসর্গ বা চুলকানির উদ্রেক হয় না।

মিলিয়ারিয়া রুব্রা ঃ এ জাতীয় ঘামাচিই সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। এতে ছোট ছোট গোলাকার দানা অথবা পানি জাতীয় দানা দেখা দেয়। লাল বর্ণের হয়ে থাকে এবং প্রচন্ড চুলকায়।

মিলিয়ারিয়া পাস্তুলোসা ঃ এ জাতীয় ঘামাচি সাধারণ একজিমা জাতীয় (ডার্মাটাইটিস) ক্ষতস্থানে হয়ে থাকে। এতে পূঁজের সৃষ্টি হয়।

মিলিয়ারিয়া প্রোফান্ডা ঃ এ জাতীয় ঘামচি দেখতে মাংসের রঙের মতো, ছোট ছোট ফুসকুঁড়ি। এ জাতীয় ঘামাচি চুলকায় না।

প্রতিক্রিয়া

ঘাম সৃষ্টি হওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে শরীরে সৃষ্ট অতিরিক্ত তাপকে বের করে দেয়া। ঘামাচি হওয়াতে ঘাম বেরিয়ে আসতে পারেনা। ফলে গরমে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে (শরীরে অতিরিক্ত তাপ জমে যেতে থাকে), মাথা ঘুরায়, মাথা ব্যথা করে, বমি বমি ভাব হয় এবং সর্বোপরি আক্রান্ত ব্যক্তি ঝিমিয়ে পড়ে। জ্বর জ্বর ভাব থাকে সব সময়। অবশ্য, অল্প ঘামাচি হলে এ জাতীয় প্রতিক্রিয়া হয় না। অন্যান্য উপসর্গ, যেমন– অতিরিক্ত চুলকানি, চুলকাতে চুলকাতে অনেক সময় বড় বড় ফোঁড়া দেখা দেয়। অতিরিক্ত লাল হয়ে একজিমার মতো হয়ে যেতে পারে।

ঘামাচি চেনার প্রধান শর্ত

এটি কখনও লোমের গোড়াতে আক্রান্ত করবে না।

চিকিৎসা

ঠাণ্ডা পরিবেশে থাকতে হবে। তাই প্রচলিত আছে যে, ঝিরিঝিরি বৃষ্টিতে গোসল করলে ঘামচি সেরে যায়।

এয়ারকন্ডিশন রুম হলে খুবই ভাল। তবে ফ্যানের হাওয়াও উপকারী।

দিনে কয়েকবার ঠান্ডা পানি দিয়ে গোসল করা।

বেবি টেলকম পাউডার ব্যবহার করা।

ঢিলেঢালা সুতি জামাকাপড় পরা বা সম্ভব হলে কিছুদিন খালি গায়ে থাকা।

ক্যালমিলন লোশন (ক্যালামিলন) ঝাঁকিয়ে নিয়ে আক্রান্ত স্থানে মেখে ঘন্টাখানেক পর ধুয়ে ফেলতে হবে। এ রকম ৩/৪ দিনের বেশি করা যাবে না।

খুব বেশি লালভাব বা একজিমার মতো হয়ে গেলে কিছুদিন কিউরল অয়েন্টমেন্ট দিনে ২ বার করে ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়।

যদি ফোঁড়া হয়ে যায় তবে এন্টিবায়োটিক যেমন ফ্লুওক্লক্সাসিলিন অথবা ইরাইথ্রোমাইসিন খেতে হয়।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

চুলের আগা ফাটা

❒ মেয়েদের চুলের আগা সাধারণত ফেটে যায়। এজন্য কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

● এটি একটি রোগ। এ অবস্থায় চুলে অন্য কোন শ্যাম্পু ব্যবহার না করে বেবি শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে। চুলের আগা ফেটে যাওয়ার জন্য প্রতিরাতে 'পালমারস্ হেয়ার ট্রিটমেন্ট ফর্মূলা' মাথায় ব্যবহার করে পরের দিন সকালে ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে এক মাস ব্যবহার করা যেতে পারে।

চুলে কলপ বা ডাই ব্যবহার

❒ অনেকের ধারণা চুলে কলপ বা ডাই ব্যবহার করলে চুল পেকে যায়। কথাটি কতটুকু সত্যি?

● চুলের কলপ বা হেয়ার ডাইয়ের সঙ্গে চুল পাকার কোন সম্পর্ক আছে বলে জানা নেই। চুলের কলপ বা ডাই কারো কারো মাথার ত্বকে এলার্জি জনিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। সেক্ষেত্রে চুলে কলপ বা ডাই ব্যবহার করা যাবে না।

চুলে জট

❒ কারো চুলে জট পাকতে শুরু করলে কেউ কেউ মনে করেন আধ্যাত্মিক কারণে এমনটি হয়েছে। সত্যিই কি তাই।

● সত্যিকার অর্থে এটি একটি রোগ। এখানে আধ্যাত্মিকতার কোনো ব্যাপার নেই। রোগটির নাম Plica Neurpoathica। সাধারণত মানসিক রোগীদের এ জাতীয় সমস্যাটি হয়ে থাকে, তাই অনেকে এটাকে আধ্যাত্মিকতার সাথে জড়িয়ে ফেলে। এর প্রধান চিকিৎসা হলো চুল চেছে ফেলা।

ক্যাস্টর অয়েল ও চুল

❐ Castor oil কি চুলের জন্যে উপকারী ? এটি ব্যবহারে চুল গজানোর সম্ভাবনা আছে কি ?

● না, Castor oil চুলের জন্যে উপকারী নয়। Oil বা তেল আমরা অভ্যাসগত বা ঐতিহ্যগতভাবে মেখে থাকি। অবশ্য মাখতে মাখতে তেলের প্রতি একটা আসক্তি এসে যায়, তখন আর না মেখে ভালো লাগেনা। একটু কষ্ট করে যদি তেল না মাখার অভ্যাস করতে পারা যায় তাহলে ধীরে ধীরে চুল তার নিজের সৌন্দর্য ফিরে পায়। অবশ্য মাঝে মাঝে চুলের অতিরিক্ত রুক্ষতা দূর করার জন্যে হেয়ার ক্রিম (Hair Cream) হালকা ভাবে মাখা যেতে পারে, তবে সবার ক্ষেত্রে বিশেষ করে যাদের চুলে তৈলাক্ত ভাব রয়েছে তাদের হেয়ার ক্রিম এর প্রযোজন হয়না। Castor oil বা কোন ধরনের তেল ব্যবহারে চুল গজানোর সম্ভাবনা নেই।

সাদা চুল

❐ অনেকে সাদা চুলে কলপ ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু কলপ ব্যবহারে কোনো পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হবার আশংকা আছে কি ?

● চুলে কলপ ব্যবহারের ক্ষেত্রে কারো কারো এলার্জি জাতীয় সমস্যা হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে কলপ ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে এবং এলার্জির চিকিৎসা নিতে হবে। পরবর্তীতে কলপের ব্রান্ড বদলিয়ে ব্যবহার করে দেখা যেতে পারে।

মাথায় উকুন

❐ অনেকেই মাথায় উকুনের সমস্যায় ভোগেন। বিশ্রী এই সমস্যার প্রতিকার কী ?

● প্রথমত একই বিছানায় ঘুমান এবং একই চিরুনি ব্যবহার করেন এমন সবাইকে একই সাথে চিকিৎসা নিতে হবে। এক্ষেত্রে লট্রিক্স ক্রিম (Lotrix cream) মাথায় মেখে ১০ মিনিট পর যে কোন শ্যাম্পু/সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে নিতে হবে এবং চুল শুকিয়ে উকুন আনার চিরুনি দিয়ে ভালোভাবে মাথা আঁচড়াতে হবে। একই ব্যবস্থা ৭ দিন পর আবার নিতে হবে। তবে মাথায় যদি ঘা বা পুঁজভাব থাকে তবে আগে এন্টিবায়োটিক খেয়ে ঘা শুকিয়ে নিতে হবে।

এলোপেসিয়া এরিয়াটা
লোকে বলে তেলাপোকায় চুল খেয়েছে

রোগের নাম Alopecia Areata (এলোপেসিয়া এরিয়েটা)। নাম থেকে বোঝা যাচ্ছে এর ধরন কি ? Areata মানে কিছু কিছু Area-তে বা জায়গায়, Alpoecia মানে চুল নেই বা টাক। এই টাক কিন্তু সে টাক নয় যা বংশগত টাক বা খুশকির কারণে আস্তে আস্তে পড়ে। এ জাতীয় টাক সাধারণত হঠাৎ দেখা দিয়ে থাকে। হয়তোবা ঘুম থেকে উঠে

হঠাৎ দেখা গেল মাথার কোন কোন জায়গায় চুল নেই। বুঝতে না পেরে বা ঘাবড়িয়ে গিয়ে বাড়ির অন্যদের জিজ্ঞাসা করলে, সমস্বরে সবাই বলে উঠবে-তেলাপোকা চুল খেয়েছে।

এ সম্পর্কে এই ধারণাটিই প্রচলিত। কারণ খুজঁতে গিয়ে অনেকে মশারির ভিতর তেলাপোকাও পেয়ে থাকেন।

এ জাতীয় টাক শুধু মাথার চুলেই হয় না, দাড়ি, গোঁফ, ভ্রূ ইত্যাদি জায়গাতেও হয়ে থাকে। প্রাথমিক পর্যায়ে সাধারণত ১/২টি এবং কয়েক দিনের ভিতর ৫/১০টি জায়গায় হঠাৎ করে গোলাকার অথবা ডিম্বাকৃতির টাক পড়ে। টাক পড়া জায়গায় কখনও কখনও ১/২টি চুল বিদ্যমান থাকলেও সাধারণত কোন চুলের গোড়াও দেখা যায় না। চক্‌চকে পিচ্ছিল মনে হয়। কখনও কখনও ত্বক একটু ঢালু বা দাবানো থাকতে পারে আবার নাও থাকতে পারে।

ঠিক একই ধরনের গোলাকার টাক কিন্তু ফাংগাস বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়াতেও হয়ে থাকে। তবে ছত্রাক কেবল অল্প বয়সের বাচ্চাদেরই হয়ে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের হয় না। কিন্তু এলোপেসিয়া এরিয়েটা যে কোন বয়সেই হতে পারে, বরং প্রাপ্ত বয়স্কদেরই বেশি হয়। ছত্রাকের কারণে যে টাক পড়ে তাতে চুলে গোড়া দেখা যায় কিন্তু এলোপেসিয়া এরিয়েটাতে চুলের গোড়া দেখা যায় না। তবে যাই হোক পার্থক্য নির্ণয় শুধু চিকিৎসার ধরন নির্ধারণের জন্য প্রয়োজনীয়। এলোপেসিয়া এরিয়েটা বা হঠাৎ এই গোলাকার টাক কেন হয় তা কিন্তু আবিষ্কৃত নয়। এ জাতীয় সমস্যা কোন জীবাণু দ্বারা সংঘটিত হয় না। তবে বংশগত একটা ব্যাপার থাকতে পারে এবং মানসিক চাপ বৃদ্ধিতে এ জাতীয় সমস্যা হওয়ার আশংকা বাড়ে। তেলোপোকা ঘুমের মধ্যে চুল কেটে নিয়েছে এটা ১০০% ভুল ধারণা। একটু সাধারণ বুদ্ধি খাটালেই বোঝা যাবে তেলাপোকা যদি চুল কাটেই তবে অন্তত, চুলের গোড়া দেখা যাবে অথবা ধরলে অনুভব করা যাবে। কিন্তু এ জাতীয় সমস্যাতে চুলের গোড়াও দেখা যায় না, হাত দিয়ে ধরে অনুভবও করা যায় না। তাই তেলাপোকা সম্পর্কিত ধারণাটি ঠিক নয়।

চিকিৎসা কেমন হবে

বাচ্চা বয়সে যদি এ জাতীয় সমস্যাটি হয় তবে এমনিতে ভাল হওয়ার সম্ভাবনা কম। প্রাপ্ত বয়স্কদের হলে কখনও কখনও কয়েক সপ্তাহ পর নিজে নিজেই ভাল হয়ে যেতে পারে। তবে সব ক্ষেত্রে নয়। কখনও কখনও ভাল না হয়ে আকারে এবং সংখ্যায় বেড়ে গিয়ে মাথার সমস্যা চুল, ভ্রূ, দাড়ি, গোঁফ ইত্যাদি ঝরে যেতে পারে। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসা একটু জটিল। তাই প্রাথমিক পর্যায়ে ছোট ছোট টাক পড়া জায়গা অর্থাৎ আক্রান্ত স্থানে স্টেরয়েড জাতীয় ইনজেকশন ত্বকের নিচে ৩/৪ সপ্তাহে পরপর ১ বার দিয়ে রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব। এতে আক্রান্ত স্থানে নতুন করে চুল গজাবে। তবে চিকিৎসা চলাকালীন নতুন জায়গা আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে সেখানেও এই ইনজেকশন দিতে হবে। একটা পর্যায়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজে নিজেই ঠিক হয়ে যাবে। আবার কখনও যদি সমস্যা দেখা দেয় হতাশ না হয়ে আবার চিকিৎসা নিতে হবে।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

সেবোরিক ফলিকুলাইটিস বা খুশকিজনিত লোমকূপের প্রদাহ

❑ কারো কারো মাথায় এবং ভ্রূতে প্রচুর ছোট ছোট গোটা হয় যা সব সময় চুলকায় কিন্তু পাকেনা। গরমে বেশি চুলকায়। এর সমাধান কী?

● সমস্যাটির নাম সেবোরিক ফলিকুলাইটিস। এজন্যে পলিটার লিকুইড দিয়ে সপ্তাহে ২ বার ৫ মিনিটব্যাপী ফেনা করে মাথা ও ভ্রূ ধুতে হবে। পাশাপাশি এন্টিফাংগাল ও স্টেরয়েড সমৃদ্ধ ক্রিম, যেমন– ফাংগিডাল এইচসি দিনে ১/২ বার লাগাতে হবে। উপকার পেলে চিকিৎসা ব্যবস্থাটি কয়েকমাস চালিয়ে যেতে হবে এবং ক্রিমের ব্যবহার ধীরে ধীরে কমিয়ে ফেলে বন্ধ করতে হবে। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে অসুবিধা হবে। তবে চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে ব্যবস্থা নেয়াই ভালো।

এন্টিড্যানড্রাফ শ্যাম্পুর ব্যবহার

❑ খুশকি দূর করার জন্যে অনেকে এন্টিড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার করেন। কিন্তু কতদিন পরপর এন্টিড্যানড্রাফ শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত?

● যারা খুব বেশি বাইরে ধূলিময় পরিবেশে কাজে ব্যস্ত থাকেন তাদের প্রতিদিনই শ্যাম্পু ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু এতে চুল রুক্ষ হয়ে যায় বলে অনেকে সেটা করতে আগ্রহী থাকেন না। তাই এক্ষেত্রে প্রথম প্রথম প্রতিদিন অথবা একদিন পরপর শ্যাম্পু করে খুশকি নিয়ন্ত্রণে এনে পরবর্তীতে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত সপ্তাহে কমপক্ষে ২ বার শ্যাম্পু করা উচিত। কারো কারো ক্ষেত্রে সপ্তাহে ১ বার ব্যবহার করলেই চলে।

মাথায় খুশকি

❑ মাথায় প্রচুর খুশকি। বিভিন্ন শ্যাম্পু, সাবান ও তেল ব্যবহারেও কোনো উপকার হয়না। খুশকি থেকে পরিত্রানের উপায় কী?

● খুশকিকে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সব সময় সম্ভব হয় না। তবে দমিয়ে রাখা সম্ভব। বিভিন্ন শ্যাম্পু ও সাবানে খুশকি দূর হবে এমন কোনো কথা নেই। তেল খুশকিকে আরো বাড়িয়ে দেয়। তবে খুশকিকে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে নতুবা ধীরে ধীরে চুল সব ঝরে যাবে। বিভিন্ন ভাবে খুশকি নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। যেমন সপ্তাহে এক থেকে দু বার পলিটার লিকুইড (Polytar liquid) দিয়ে মাথা ধুতে হবে। পলিটার লিকুইড মাথায় মেখে ফেনা করে ১০ মিনিট রাখতে হবে। যতদিন খুশকি নিয়ন্ত্রণে না আসছে ততদিন পলিটার লিকুইড মেখে যেতে হবে। কখনো কখনো সপ্তাহে এক দুবার পলিটার লিকুইড দিয়ে মাথা ধোয়াই যথেষ্ট হয়। সেক্ষেত্রে প্যানটিন প্রো-ভি (Pantene pro-V) শ্যাম্পু দিয়ে প্রয়োজনে সপ্তাহের অন্যান্য দিন মাথা ধুতে হবে। যদি শ্যাম্পু দিয়ে প্রতিদিন মাথা ধোয়ার প্রয়োজন পড়ে তাহলে তাই করতে হবে। মাথায় প্রতিদিন শ্যাম্পু দিলে চুলের ক্ষতি হয় না।

❑ অনেকেই খুশকি দূর করতে মাথায় খৈল মেখে কিছুক্ষণ পর মাথা ধুয়ে ফেলেন, এতে কি কোন লাভ হয় ?

● নিজে ডাক্তারী ফলাতে গিয়ে রোগীরা বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করে চিকিৎসাকার্যে। তেমনি একটি উপাদান হচ্ছে সরিষার খৈল। সরিষা থেকে তেল বের করার সময় বর্জ্য পদার্থ হিসাবে এই খৈল পাওয়া যায়। এটি গো খাদ্য হিসাবে সমাদৃত। এই খৈল অনেকেই মাথায় ব্যবহার করেন খুশকি দূর করার জন্য। খৈল ব্যবহারে খুশকি দূর হয় এ ধারণা অনেকেরই। প্রকৃতপক্ষে এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। খৈল ব্যবহারের কারণে মাথার শুষ্ক খুশকিগুলো ভিজে মাথার ত্বকে লেগে থাকে এবং দেখা যায় না। আর একেই অনেকে খুশকি চলে গেছে বলে ভাবে এ বিষয়ে বিশিষ্ট চর্ম বিশেষজ্ঞ ডাঃ এম ইউ কবীর চৌধুরী বলেন, খৈল ব্যবহারে কখনই খুশকি দূর হয় না। খুশকি অদৃশ্যমান হয়, দূর হয়েছে বলে মনে হয়। কিন্তু খুশকির জায়গায় খুশকি ঠিকই থাকে। তাঁর কথা হচ্ছে চুলে খুশকি বিভিন্ন কারণে হয়। কারণ নির্ণয় করে এই খুশকি দূর করাতে হবে বিভিন্ন ধরনের খুশকির বিভিন্ন চিকিৎসা। খুশকি সম্পূর্ণ নিরাময় গ্যারান্টি দেয়া যায় না। চিকিৎসার মাধ্যমে একে দমিয়ে রাখা যায়। আর সেটাই আসল কাজ। এজন্য এন্টিড্যানড্রাফ শ্যাম্পু, এন্টিফাঙ্গাল প্রিপারেশন ব্যবহার এবং চুল ভেজা না রাখা, মাথা পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। একজন চর্ম বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে সঠিক মতামত রাখতে পারেন। খুঁজে বের করতে পারেন খুশকির কারণ ও তার যথাযথ চিকিৎসা। কাজেই অযথা মাথায় খৈলের বোঝা না বাড়িয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। খৈল ব্যবহারে তাৎক্ষণিকভাবে পুলকিত হবেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবে না।

ছত্রাক থেকে খুশকি

❑ ছত্রাকের কারণে কি খুশকি হতে পারে ? পলিটার, সেলসান-ব্লু কি ছত্রাকের বিরুদ্ধে কাজ করে ? খুশকি নিয়ন্ত্রণ করা কি সত্যি সম্ভব ?

● হ্যাঁ, ছত্রাকের কারণে খুশকি হতে পারে। পিটাইরো স্পোরোন জাতীয় ছত্রাক, যা কি-না সবার ত্বকেই থাকে তা খুশকির পরিমাণকে বাড়িয়ে দেয়। তাই এই পিটাইরো স্পোরোনের পরিমাণ কমাতে পারলে খুশকির পরিমাণ কমবে। এই জাতীয় ছত্রাকের বিরুদ্ধে সেলসান-ব্লু'র ভূমিকা আছে, পলিটারের নেই। খুশকি কনট্রোল করা বা দমিয়ে রাখা সম্ভব।

খুশকির চিকিৎসায় মেহেদী

❑ অনেকে খুশকির জন্যে মাথায় মেহেদী দেন। মাথায় মেহেদী দিলে কি সত্যিই খুশকি কমে ?

● হ্যাঁ, মাথায় মেহেদী ব্যবহার করলে খুশকি কম হয়। মাথায় মেহেদী ব্যবহার করার নিয়ম হলো মেহেদী পাতা শুকিয়ে পাউডার করে নিতে হবে, তারপর অল্প পানির সাথে মিশিয়ে মাথায় লাগানোর পর ৫ থেকে ৭ মিনিট তোয়ালে দিয়ে মাথা ঢেকে

রাখতে হবে। তারপর সাবান দিয়ে মাথা ধুয়ে ফেলতে হবে। এভাবে সপ্তাহে একবার করে তিনমাস ব্যবহার করলে খুশকি কমে যাবে।

টাক সমস্যা

❐ কারো কারো মাথার চুল ক্রমশ পড়ে যায় এবং টাক জেগে ওঠে, বিশেষ করে মাথার সামনের দিকে টাক পড়তে শুরু করে। এ অবস্থায় চুলপড়া রোধ কল্পে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে?

● বংশগত কারণে চুল ঝরে গেলে সেক্ষেত্রে তেমন কিছু করার থাকে না। তবে মাথায় খুশকি থাকলে কিংবা অন্য কারণে চুল পড়ে গেলে চিকিৎসার মাধ্যমে তা নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়। এক্ষেত্রে নিজোরাল শ্যাম্পু সপ্তাহে ২/৩ বার ব্যবহার করা যেতে পারে। আর চর্ম বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে কি কারণে চুল পড়ছে? এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

চুল পড়া গোলাকার হয়ে

❐ অনেকের মাথার চুল মাঝে মাঝে পড়ে গিয়ে চামড়া বের হয়ে যায়। এর প্রতিকার কী?

● চুল পড়ে যদি মাথায় গোলাকার টাক হয় তবে সমস্যাটির নাম 'এ্যালোপেসিয়া এরিয়েটা'। এক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানে স্টেরয়েড ইনজেকশন দিতে হয়। একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞই সে ব্যবস্থা নিবেন। আর যদি সমস্ত মাথা থেকে চুল ঝরে গিয়ে টাক পড়ে তবে সেটা 'ডিফিউজ এ্যালোপেসিয়া'। এক্ষেত্রে অনেক কারণের মধ্যে খুশকি একটি অন্যতম কারণ। এন্টিড্যানড্রাফ বা খুশকি বিরোধী শ্যাম্পু দিয়ে (যেমন-পলিটার, সেলসান ব্লু) সপ্তাহে ১-২ বার মাথা ধুলে উপকার পাওয়া যায়।

চুল কামানো ও শেভ করা

❐ অনেকে মনে করেন বার বার চুল কামালে বা শেভ করলে চুল ঘন ও কালো হয়। এ ধারণাটি কতটুকু ঠিক?

● এ ধারণাটি মোটেও ঠিক নয়। বার বার চুল কামালে বা শেভ করলে চুল ঘন ও কালো কোনোটাই হয় না। চুল ঘন ও কালো হওয়ার ব্যাপারটি অনেকটাই বংশগত।

গরম পানি দিয়ে গোসল করলে কি চুল পাকে?

❐ কারো কারো ধারণা গরম পানি দিয়ে গোসল করলে নাকি মাথার চুল পেকে যায়। কথাটি কতটুকু সত্যি?

● চুল পাকার কারণ অনেক। তবে গরম পানি দিয়ে গোসল করলে চুল পাকে এরকম কোন তথ্য প্রমাণ চিকিৎসা বিজ্ঞানে নেই। কাজেই এটা সত্যি নয় বলে ধরে নেয়া যায়।

দৈনিক কয়টি চুল পড়তে পারে

❒ অনেকেরই প্রতিদিন ১৫-২০টি করে মাথার চুল ঝরে যায়। এর প্রতিকার কী ?

● মাথার প্রতিটি চুলের একটি নির্দিষ্ট স্থায়ীত্বকাল আছে। নির্দিষ্ট সময়ের পর যে চুলটি ঝরে যাওয়ার তা যাবেই এবং সেই স্থানে নতুন চুল গজাবে। স্বাভাবিকভাবে এই ঝরে যাওয়া চুলের পরিমাণ হচ্ছে দৈনিক ১০০টি। যদি কোন কারণে ১০০টির বেশি চুল ঝরতে থাকে, তবেই মাথায় টাক দেখা দেয় এবং তখন চিকিৎসার প্রয়োজন হয়। তাই প্রতিদিন ১৫-২০টি করে মাথার চুল ঝরে যাওয়া একটি স্বাভাবিক ঘটনা। এর জন্যে চিকিৎসার প্রয়োজন নেই।

বন্ধু সাবধান! এখনও যাদের টাক পড়েনি

দিন দিন মাথার চুল পাতলা হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ঝরে যাচ্ছে বা টাক পড়ে যাচ্ছে এমন ব্যক্তির সংখ্যা অনেক। চুল ঝরে যাওয়া বা টাক পড়া দুইভাবে হয়ে থাকে।

Diffuse Alopecia অর্থাৎ পুরো মাথার চুল এমনভাবে ঝরে যাচ্ছে যে, মাথার তালু বা চামড়া অতি সহজেই দেখা যায়।

Patchy Alopecia অর্থাৎ মাথার কিছু কিছু অংশে গোল গোল আকারে চুল পড়ে যাওয়া।

টাক পড়া সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার আগে চুলের বিভিন্ন পর্যায় বা Stage সম্পর্কে কিছু জানা প্রয়োজন।

গজানো থেকে শুরু করে ঝরে যাওয়া পর্যন্ত চুল তিনটি পর্যায় পার হয়–

Anagen stage বা চুল গজানোর পর্যায়– এই ধাপটি দেখা যায় না। এ সময়ে ত্বকের ভিতরে গোড়া থেকে চুল গজাতে থাকে। এতে সময় লাগে প্রায় ৩-১০ বছর।

Catagen stage বা চুল পরিপক্বতা লাভের ধাপ-চুল গজানো শেষ হয়ে পরিপক্বতা লাভ করতে চুলের সময় লাগে ২-৩ সপ্তাহ।

Telogen stage বা চুল ঝরে যাওয়ার ধাপ-এ অবস্থার শেষে (৩-৪ মাস) চুল আপনা আপনি ঝরে যায় এবং এটাই স্বাভাবিক। নতুন চুল আবার গোড়া থেকে গজিয়ে শূন্য জায়গা পূরণ করে নেয়। মাথার চুলের আনুমানিক সংখ্যা প্রায় ১ লাখ। এর মধ্যে ৭০-১০০টি চুল প্রতিদিন ঝরে যায়। অর্থাৎ প্রতিদিন ১০০টি চুল প্রতিদিন ঝরে যায়। কাজেই প্রতিদিন ১০০টি চুল পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু যখন এই

১০০টির বেশি চুল পড়ে, তখনই মাথার তালু খালি হয়ে যেতে থাকে।

সার্বিকভাবে পুরো মাথার চুল যেসব কারণে ঝরতে পারে –

Traction-প্রচলিত একটি ধারণা আছে যে রাতে শোবার আগে টান টান করে বেণী বেঁধে ঘুমালে চুল তাড়াতাড়ি লম্বা হয়। এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। চুল কতটুকু লম্বা হবে তা নির্ভর করে জেনেটিক, হরমোন ও পুষ্টির ওপর। বরঞ্চ উল্টো ক্ষতিই হয়ে থাকে। যে চুলগুলো আরও কিছুদিন মাথায় থেকে তারপর ঝরে যাওয়ার কথা, তা পূর্বেই ঝরে যায় অতিরিক্ত টান লাগার কারণে।

Postpartum বা প্রসব পরবর্তী–বাচ্চা প্রসবের ২-৫ মাস পর হঠাৎ চুল ঝরে যেতে থাকে। মাথা প্রায় খালিই হয়ে যায়। প্রায় ২-৬ মাস ধরে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তবে আশার বিষয় যে এ চুল আবার সম্পূর্ণ গজিয়ে থাকে।

Postnatal বা নবজাত অবস্থায়-নবজাতকের মাথার চুল জন্মের পর থেকে ৪ মাসের ভিতর অনেকটাই ঝরে যায়। এতে মা-বাবা ভয় পেয়ে যান এবং ভাবেন বাচ্চার মাথার চুল কি কম হবে! না, এতে ঘাবড়ানোর কিছু নেই। ছয় মাস বয়সের সময় আবার চুল গজিয়ে যাবে। কখনও কখনও পুষ্টিহীনতার কারণে চুল গজাতে একটু দেরি হতে পারে।

Post febrile বা জ্বরের পর-কঠিন কোন জ্বর, যেমন নিউমোনিয়া, টাইফয়েড হওয়ার ২-৪ মাস পর হঠাৎ চুল ঝরতে শুরু করে এবং প্রায় পাতলা হয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন পর এ চুল আবার গজিয়ে থাকে।

Psychogenic বা মানসিক কারণ-মানসিক রোগ বা দুশ্চিন্তা বেশি করলে চুল পড়ে যায়। দুশ্চিন্তা যদি বেশি দিন থাকে তবে চুল কয়েক দফায় (repeated) ঝরতে পারে।

Drug বা ওষুধে-কিছু কিছু ওষুধ সেবনে চুল পড়ে যেতে পারে, যেমন-ইনডোমেথাসিন (ব্যথার ওষুধ) জেনটামাইসিন (এন্টিবায়েটিক), প্রপ্রানোলল (ব্লাড প্রেসারে ওষুধ) ইত্যাদি। এসব ওষুধে সেই চুলগুলোই ঝরে যায় যেগুলো হয়ত আর ক'দিন পরেই ঝরে যেত। কিন্তু কিছু কিছু ওষুধ, যেমন– ক্যানসারের ওষুধ, যে চুলগুলো মাত্র গজাচ্ছে, সেগুলোকেও ঝরিয়ে দেয়।

Starvation বা অনাহার-ওজন বা মেদ কমানোর জন্য অনেকে হঠাৎ খাওয়া-দাওয়া একেবারেই ছেড়ে দেয়। এই হঠাৎ খাওয়া কমানো চুল পড়ার কারণ হতে পারে, যেমনটি হয় অপুষ্টিজনিত কারণে।

Androgen hormore বা পুরুষ হরমোন-এর প্রভাবে ২০-৩০ বয়সের পুরুষদের কপালের দুই দিক এবং মাথার মধ্য অংশে টাক পড়ে। যাকে বংশগত টাকও বলা হয়। যদিও এ বিষয়ে বিতর্ক আছে। মহিলাদের ক্ষেত্রে-৪৫ বছর বয়সে মাসিক বন্ধ হয়ে যায় এবং শরীরে পুরুষ হরমোনের (Androgen) আধিক্য হয় ও একই রকম টাক পড়তে পারে।

প্যাচি অ্যালোপেসিয়া বা মাথার কিছু অংশে গোলাকার হয়ে চুল পড়ার কারণ–

অনেক চর্মরোগে এ জাতীয় গোলাকার টাক দেখা দেয়। তবে তার মধ্যে অন্যতম একটি হচ্ছে–

Alopecia Areate-এ অবস্থায় রোগী কোন একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখে যে মাথার কিছু কিছু অংশে গোলকার টাক পড়েছে। আক্রান্ত স্থানের ত্বক মসৃণ, কোন চুলকানি বা লাল ভাব নেই। কোন খোসাও নেই। প্রচলিত ধারণা হচ্ছে যে, তেলাপোকা চুল খেয়ে ফেলেছে। না, এটি সম্পূর্ণ ভুল ধারণা। এ অবস্থা বেড়ে গিয়ে সম্পূর্ণ মাথার, এমনকি সমস্ত শরীরের পশমও ঝরে যেতে পারে। তবে যাই হোক এটি নিজে থেকেই ভাল হয়ে যায় (কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া)।

আক্রান্ত স্থানে স্টেরয়েড ইনজেকশন দিয়ে আকারে বেড়ে যাওয়াটাকে রোধ করা যায় এবং নতুন চুল গজাতেও থাকে। তবে এটি আবারও হতে পারে। এ জাতীয় সমস্যা যে কোন বয়সেই হতে পারে।

Tenia Capitis-ফাংগাস বা ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হলে মাথায় গোল গোল টাক পড়ে। এন্টিফ্যাংগাল খেলে ভাল হয়ে যায়। এটি সাধারণত স্কুলে যায় এমন বয়সের ছেলে-মেয়েদের হয়ে থাকে। আক্রান্ত স্থানের ত্বকে খোসা থাকে, কখনও কখনও শুধু কালো কালো চুলের গোড়া দেখা যায়, আবার কখনও পুঁজভাবে দেখা দেয়।

শেষ কথা

এতসব কারণের মধ্যে পাঠকবৃন্দের কাছে আমার একটা ব্যক্তিগত মতামত রেখে শেষ করতে চাই। আর তা হচ্ছে যে মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ হচ্ছে "খুশকি"। মাথা চুলকালে গুঁড়া গুঁড়া খোসা দেখা যাওয়াটাকে খুশকি বলে। তবে কখনও কখনও খোসা দেখা যায় না, মাথায় শুধু তেলতেলে ভাব থাকে। এই খুশকিকে যদি দমিয়ে রাখা যায় তবে মাথায় যে চুল আছে তাকে হয়ত আরও ১০/২০ বছর টিকিয়ে রাখা যাবে। তবে একটি বিষয় জেনে রাখা ভাল যে খুশকি বা তেলতেলে ভাব (সেবোরিয়া) বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হরমোন (এনড্রোজেন)-এর প্রভাবে হয়ে থাকে। সুতরাং এমতাবস্থায় খুশকিকে দমিয়ে রাখা সম্ভব। আর খুশকি হবে না, এটা বলা সম্ভব নয়, যেহেতু এনড্রোজেন হরমোন কমানো উচিত নয়। ডায়াবেটিস ভাল হয় না এই ভেবে কেউ এটাকে কন্ট্রোল না করলে সে মারা যাবে। ব্লাড প্রেসার ভাল হয় না জেনে কন্ট্রোল না করলে পরের দিনই স্ট্রোক করে মারা যেতে পারেন। তাই খুশকি ভাল হয় না জেনে এটাকে নিয়ন্ত্রণে না রাখলে সব চুল পড়ে যাবে কয়েক বছরেই। তখন আর মামলা করে লাভ নেই। এন্টি ডেনড্রাফ শ্যাম্পু, যেমন-পলিটার, সেলসান ব্লু এবং আরও অনেক শ্যাম্পু দিয়ে খুশকি কন্ট্রোল করা যায়। প্রয়োজনে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে পারেন।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

চোখের পাপঁড়িতে খুশকি

❒ অনেকের চোখের পাপঁড়ির গোড়াতে সাদা খুশকির মতো হয়, চোখ চুলকায় ও পাপঁড়িগুলো ঝরে যায়। এর চিকিৎসা ব্যবস্থা কী ?

● এ জাতীয় সমস্যাকে সেবোরিক ব্লেফারাইটিস (Seborrhic Blepharitis) বলে। এজন্যে সপ্তাহে ২/৩ বার যে কোন বেবি শ্যাম্পু দিয়ে আক্রান্ত স্থানটি ধুয়ে দিতে হবে। এছাড়া নিজোরাল ক্রিম (Nizoral cream) নামের ওষুধটি দিনে ১ বার একাধারে দুই মাস মাখলে উপকার পাওয়া যায়।

ভ্রূ ওঠা

❒ কারো কারো চোখের ভ্রূ ওঠে যেতে থাকে। কোনো খুশকি নেই তারপরও ওঠে। এর প্রতিকার কী ?

● এ অসুখটির নাম এ্যালোপেসিয়া এরিয়েটা। এ জাতীয় সমস্যা শুধু ভ্রূ নয়, শরীরের যেকোন জায়গাতেই হতে পারে। সাধারণত মাথায় বেশি হয়ে থাকে। অনেকের ধারণা তেলাপোকা চুল খেয়ে ফেলেছে। কিন্তু ধারণাটি ভুল। এ জাতীয় সমস্যায় চিকিৎসাক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানে ত্বকের নিচে Triamcinolone Acetonide নামক স্টেরয়েড ইনজেকশন দিতে হয়। তবে এক্ষেত্রে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

চুল লালচে

❒ কারো কারো মাথার চুল লালচে আকার ধারণ করে। কয়েকটি পাকা চুলও দেখা যায়। চুলকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে কী করণীয় ? কোনো তেল ব্যবহার উপকার পাওয়া যায় কি ?

● বয়স ৩০ বছর পেরিয়ে গেলে একটি দুটি করে চুল পাকা শুরু হতে পারে। এছাড়া যেকোনো বয়সে দুএকটি চুল পাকা থাকতেও পারে। এনিয়ে দুঃশ্চিন্তা করার কিছু নেই। চুলের লালচে ভাব দূর করতে তেলের কোনো ভূমিকা নেই, বরং তেল ব্যবহারে কখনো কখনো চুল লাল হয়ে যায়। তেলের এসিড চুলের চক্চকে স্তরকে ক্ষয় করে ফেলে। তবে যতদিন তেল মাখা চলতে থাকে ততদিন এই ক্ষয়ভাব বোঝা যায় না, তেল মাখা বন্ধ করলেই সেই ক্ষয়ভাব ভেসে ওঠে এবং চুল লাল দেখায়, কখনো কখনো জট বাঁধতে শুরু করে তাড়াহুড়া করে আবার তেল মাখতে হয় এবং মনে হবে যেন তেলছাড়া একদিনও টেকা সম্ভব নয়। তবে তেল মাখাবন্ধ করে কয়েকমাস যদি ধৈর্য ধরে থাকা যায় তাহলে দেখা যাবে তেল ছাড়াই চুল আবার সুন্দর ও কালো হয়ে যাচ্ছে। তবে সাময়িক রুক্ষতা দূর করার জন্যে হেয়ার ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে।

দাড়ি গোঁফের লালচে ভাব

❒ অনেকের মুখের দাড়ি ও গোঁফে লালচে ভাব ধরেছে, এ অবস্থায় করণীয় কী ?

● যদি বংশগত কারণে এটি হয় সেক্ষেত্রে তেমন কিছু করার নেই। তবে কখনো কখনো বিভিন্ন ধরনের মিনারেল যেমন-জিংক, প্রোটিন ইত্যাদির অভাবেও এমনটি হতে পারে। এক্ষেত্রে মাল্টিভিটামিন ও মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খেয়ে উপকার পাওয়া যেতে পারে। সামুদ্রিক মাছে প্রচুর জিংক থাকে। বেশি করে সামুদ্রিক মাছ খেতে হবে।

হেয়ার রিমুভিং ক্রীম

❒ অনেকে শরীরের অবাঞ্ছিত লোম দূর করার জন্যে হেয়ার রিমুভিং ক্রিম ব্যবহার করেন। ইলেকট্রো ইপিলিয়েশন কি একই রকম পদ্ধতি ?

● না। হেয়ার রিমুভিং ক্রিম ব্যবহার একটি অস্থায়ী পদ্ধতি। যখন ব্যবহার করা হয় তখন লোম ঝরে যাবে। ব্যবহার বন্ধ করলে আবার গজাবে। এভাবে ব্যবহার করতে করতে কখনো কখনো ব্যক্তি বিশেষে এলার্জি দেখা দিতে পারে। তখন আর হেয়ার রিমুভার ব্যবহার করা সম্ভব নয়। ইলেকট্রো ইপিলিয়েশন একটি স্থায়ী পদ্ধতি। এ পদ্ধতিতে লোমের গোড়াকে ধ্বংস করে দেয়া হয় এবং সেখান থেকে আর লোম গজায় না।

এসিডে পোড়া ত্বক

❒ হাত বা শরীরের অন্যস্থানে এসিডে পুড়ে গেলে যে দাগ হয় তা দূর করা সম্ভব কি ?

● কতোটুকু স্থান পুড়েছে তার উপর নির্ভর করে চিকিৎসা ব্যবস্থা। তবে প্লাষ্টিক সার্জারির মাধ্যমে এ ধরনের দাগ দূর করা সম্ভব।

হাঁটুর নিচে লোমের গোড়া পেকে যাওয়া

❒ অনেকের দু'পায়ের বিশেষ করে হাঁটুর নিচের প্রায় প্রতিটি লোমের গোড়া পাকে ও পুঁজ হয়। এর সমাধান কী ?

● এ জাতীয় সমস্যাকে chronic folliculitis বলে। এজন্য একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনেই চিকিৎসা নেয়া উচিত। তবে Betadine ointment প্রতিদিন গোসলের আধাঘন্টা আগে মেখে গোসল করলে উপকার পাওয়া যেতে পারে। ভালো হয়ে যাবার পরও এই ওষুধটি সপ্তাহে এক দু'বার ব্যবহার করতে হবে।

পায়ের তলায় কর্ন

❒ কারো কারো পায়ের তালুতে শক্ত গুটির মতো হয়, হাঁটলে ব্যথা করে। এর চিকিৎসা কী ?

● মেডিকেল পরিভাষায় এটাকে Corn (কর্ন) বলে। ইলেকট্রিক মেশিন দিয়ে বিনা রক্তপাতে অতি সহজেই এটি

নির্মূল করা যায়। তবে অসুবিধা হলো ক্ষত ভরে আসতে ১০-১৫ দিন সময় লাগতে পারে এবং সে সময়ে কয়েকবার ড্রেসিং পরিবর্তন করতে হয়।

পায়ের পাতায় ছোট গর্ত

❐ অনেকের পায়ের পাতায় ছোট ছোট গর্ত দেখা যায়। কেউ কেউ বলে কাদায় পা খেয়েছে। এর চিকিৎসা কী?

● এ রোগটির নাম 'প্লান্টার কেরাটোডার্মা'। এ জন্যে ২% আংগুয়েন্টাম এসিড স্যালিসাইলিক মলম রোজ রাতে ২ মাস লাগাতে হবে।

ত্বকে উকুন

❐ অনেকের শরীরে, বিশেষ করে শরীরের নিম্নাংশে উকুন দেখা দেয়। এর চিকিৎসা কী?

● প্রথমত যে সব জায়গায় এ জাতীয় উকুন দেখা দেয় সে সমস্ত জায়গার লোম চেছে ফেলতে হবে। লোম চেছে ফেললে ভালো হয়ে যাবার সম্ভাবনা আছে। অন্যথায় Lotrix নামক ক্রিমটি রাতে মেখে সকালে গোসল করে নিতে হবে। প্রথম দিন ক্রিমটি ব্যবহার করার পর ৭দিন পরে ক্রিমটি আরেকবার ব্যবহার করতে হবে।

চোখের নিচে কালি

❐ কারো কারো চোখের নিচে কালো ভাব দেখা দেয়। এর প্রতিকার কি?

● চোখের নিচে কালোভাব হওয়াটা কখনো কখনো জেনেটিক বা জন্মগত ব্যাপার। সেক্ষেত্রে কিছু করার থাকেনা। অনেক সময় চোখে কোনো সমস্যা থাকলে (দৃষ্টিগত) কালোভাব দেখা দিতে পারে। সেক্ষেত্রে চক্ষু বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চশমা নিলে ঠিক হয়ে যায়। অতিরিক্ত দুঃশ্চিন্তা ও অনিদ্রা থাকলে কালোভাব আসতে পারে। তখন মনোরোগ রোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে ভিটামিন-ই ক্রিম ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া যায়।

অল্প দাউদ

❐ অনেকের প্রায়ই শরীরের বিভিন্ন জায়গায় প্রথমে ফুসকুঁড়ির মতো ওঠে এবং পরে আস্তে আস্তে তা রিং-এর মতো গোলাকার রূপ ধারণ করে। এগুলো খুব চুলকায়, চুলকালে কষ বের হয়। এর সমাধান কী?

● এটি একটি ছত্রাক জনিত সমস্যা। যদি অল্প জায়গায় হয়ে থাকে তবে Conasyd cream নামক ওষুধটি প্রতিদিন রাতে ১ বার করে মাস খানেক ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। সমস্যাটা যদি বেশি হয় তাহলে মুখে ওষুধ খেতে হবে। সেক্ষেত্রে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরনাপন্ন হতে হবে।

দীর্ঘস্থায়ী দাউদ

❐ শরীরে বিভিন্ন জায়গায় গোলকার দাগ রয়েছে। এই গোলাকার দাগের পরিধি

বরাবর ছোট ছোট দানার মত পাশাপাশি অবস্থান করছে। গোলাকার দাগের মাঝখানের ত্বক তুলনামূলক মসৃন ও চক্‌চকে। এগুলো খুব চুলকায়, চুলকালে লাল হয়, কষ ঝরে। এ অবস্থায় দাউদ নিরাময়ের জন্য এন্টিফাংগালমলম ব্যবহার করেও লাভ হয়নি। এ অবস্থায় করণীয় কী ?

● এক্ষেত্রে মুখে এন্টিফাংগাল ওষুধ খাওয়া যেতে পারে। তবে ওষুধটি সতর্কতার সঙ্গে গ্রহণ করতে হয়। বিশেষ করে লিভার ও কিডনির কাজ ঠিকমত না চললে এটি গ্রহণে ঝুঁকি আছে। সুতরাং চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে এটি গ্রহণ করা উচিত। শরীরে যেকোন স্থানের দাউদের জন্য ফ্লুকোনাজল জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করা যেতে পারে। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ফ্লুকোনাজল উপাদানের ওষুধ প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মি. গ্রা. এর ১টি ক্যাপসুল মোট ৪-৬ সপ্তাহ খেতে হবে। এতে দাউদ একেবার সেরে যাবে। কিন্তু পরবর্তীতে যেন এটি আর না হয় সেজন্য সর্তক থাকতে হবে। অর্থাৎ ত্বক পরিষ্কার ও শুষ্ক রাখতে হবে। আর গর্ভাবস্থায় এবং স্তন্যদায়ী মায়েদের ক্ষেত্রে এটি না খাওয়াই ভাল।

শিশুর দাউদ

❐ শিশুদের অনেক সময় শরীরের বিভিন্ন স্থানে যেমন– হাতে, পায়ে, বুকে পিঠে দাউদ দেখা দিয়ে থাকে। শিশুদের ক্ষেত্রে দাউদ মলমে না সারলে সেক্ষেত্রে করণীয় কী ?

● শিশুদের দাউদ মলমে না সারলে সেক্ষেত্রে মুখে খাওয়ার এন্টিফাংগাল ওষুধ দেয়া যেতে পারে। এন্টিফাংগাল ওষুধের মধ্যে ফ্লুকোনাজল উপাদান সমৃদ্ধ সাসপেনশন বয়সভেদে বিভিন্ন মাত্রায় দেয়া যেতে পারে।

বয়স	গড় ওজন	মাত্রা/দৈনিক
১ বছর	৯ কেজি	১/২ চা চামচ
১-২ বছর	১২ কেজি	১ চা চামচ
২-৩ বছর	১৪ কেজি	১১/২ চা চামচ
৩-৪ বছর	১৬ কেজি	২ চা চামচ
৪-৬ বছর	২০ কেজি	২১/২ চা চামচ

উল্লেখিত ছক অনুযায়ী চিকিৎসকের পরামর্শ খাওয়াতে হবে। ওষুধটি বেশ কিছুদিন ধরে খেতে হয়। তবে কিডনি ও লিভারের কোন অসুখ থাকলে এটি খাওয়া যাবে না।

শরীরে জুড়ে ছত্রাক

আমাদের দেশে প্রতি পাঁচ জনের একজন বছরে একবার ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। অর্থাৎ আক্রান্ত ব্যক্তির সংখ্যা অনেক। এখানে আলোচনা করা হচ্ছে সেই জাতীয়

ছত্রাক সম্পর্কে যা আক্রান্ত করে থাকে ত্বক, নখ ও চুল। এ জাতীয় অসুখ জীবননাশের কারণ না হলেও জীবনযাত্রাকে করে মারাত্মকভাবে ব্যাহত। যেমন অতিরিক্ত চুলকানির উদ্রেক, কখনও কখনও কষ ঝরতে থাকা, পুঁজ আকারেও অনেক সময় দেখা দিয়ে জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলে।

মানুষ ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে সাধারণত পোষা প্রাণী থেকে, সেলুনে ব্যবহৃত ব্রাশ থেকে (একাধিক মানুষে ব্যবহারের ফলে), সিনেমা হলের সিট, অন্যের ব্যবহার করা টুপি, হ্যাট এবং সর্বোপরি একজন মানুষ থেকে অন্য মানুষে স্পর্শের মাধ্যমে। অতিরিক্ত ঘাম ছত্রাক আক্রমণে সহায়তা করে থাকে। যার ফলে যারা সারাদিন জাঙ্গিয়া সহকারে প্যান্ট পরে থাকে, সব সময় জুতা পরে থাকে তাদের কুচঁকিতে (রানের চিপায়) এবং পায়ে আঙ্গুলের মাঝখানে ছত্রাকে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে।

মাইক্রোস্কোপ বা ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপে ছত্রাক দেখতে লতা-পাতার মতো গুল্ম বিশেষ। কিন্তু খালি চোখে তো আর তা দেখা যায় না। শুধু দেখা যায় অসুখের স্বরূপ। সাধারণ ভাষায় আমরা যাকে "দাউদ" বলে থাকি। ইংরেজীতে সাধারণ ভাষায় এর নাম হচ্ছে রিং ওয়ার্ম ইনফেকশন। রিং মানে আংটির মতো গোলাকার। হ্যাঁ, সত্যিই, সাধারণভাবে বর্ণনা করতে গেলে বলতে হয় যে, আক্রান্ত স্থানটিতে এক বা একাধিক গোলাকার (মার্জিন বা কিনারা একটু লাল, উঁচু ভাব এবং এই রিংয়ের ভিতরের অংশে সাধারণত সমান বা কোন উঁচু ভাব নেই) ইনফেকশন দেখা দেয়। স্থান বিশেষে এ জাতীয় রিং থাকে না। তখন সাধারণ মানুষ এটিকে আর দাউদ বা রিং ওয়ার্ম হিসাবে চিনতে পারে না।

জায়গা বিশেষে দাউদ (রিং ওয়ার্ম)-এর স্বরূপ

মাথা : সাধারণত স্কুলে যায় এমন বয়সের ছেলেমেয়েদের মাথায় হয়ে থাকে দাউদ বেশি। বিভিন্নভাবে এটি মাথায় দেখা দিয়ে থাকে–

❒ হঠাৎ দেখা যাবে যে, মাথার কিছু কিছু জায়গায় গোল গোল টাক পড়েছে। টাক পড়া অংশে সামান্য ভাঙ্গা বা ছোট ছোট চুল বা শুধু চুলের কালো কালো গোড়া অবশিষ্ট থেকে যায়। প্রচলিত ধ্যানধারণা হচ্ছে যে, তেলাপোকা রাতে ঘুমের সময় চুল খেয়ে ফেলেছে। না, এ ধারণাটি সম্পূর্ণ ভুল। এটি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ফলেই হয়েছে।

❒ মাথায় আরেকটি প্রকারভেদ, যেটিতে পুঁজ পুঁজ ভাব হয়ে থাকে। পুঁজ ভাবে দেখে অনেকে এন্টিবায়োটিক খেয়ে থাকেন। কিন্তু যেহেতু এটি ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত, তাই এন্টিবায়োটিক খেয়ে ভাল হয় না। আক্রান্ত স্থানের চুল ঝরে যায়। সঠিক সময়ে চিকিৎসা না নিলে আক্রান্ত স্থানে পুনরায় চুল নাও গজাতে পারে।

মুখ ও দাড়ি : এ সমস্ত জায়গাও ছত্রাক দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকে। দাড়িতে গুচ্ছ গুচ্ছ ভাবে আক্রান্ত স্থানের লোমের গোড়াতে পুঁজ দেখা যায়। আক্রান্ত স্থানে একটু উঁচু বা ফোলা ফোলা ভাব দেখা দেয়। লোমের গোড়া খুব নরম হয়ে যায় এবং কখনও কখনও ঝরে যায়।

মুখ : লোম নেই এমন জায়গা যখন আক্রান্ত হয় তখন একটু লাল লাল ভাব এবং খোসা দেখা যায়। কিন্তু রিং ওয়ার্মের যে রিং (উঁচু কিনারা বা বর্ডার) তা সহসা দেখা যায় না।

নখ : নখ যখন আক্রান্ত হয় তখন একটি, দু'টি, তিনটি নখ ক্রমান্বয়ে আক্রান্ত হতে থাকে। সাধারণ ভাষায় বলতে গেলে বলতে হয় নখ মরে যায়। নখ ভেঙ্গে যায়, নষ্ট হয়ে যায়। এখানেও "রিং" দেখা যায় না।

হাত-পা : এ জায়গাগুলোতে বিশেষ করে পায়ে, দু'আঙ্গুলের মাঝখানটা আক্রান্ত হয়ে থাকে। আক্রান্ত স্থানের চামড়া খোসা আকারে উঠতে থাকে। কখনও কখনও পানি-গোটার মতো দেখা দেয়। অতিরিক্ত চুলকায়। এ জায়গাগুলোতেও 'রিং' য়ের তেমন কোন অস্তিত্ব দেখা যায় না।

শরীর, কুচকি (রানের ভাঁজ) : এ জায়গাগুলোতেও ছত্রাক বিভিন্নভাবে দেখা দিতে পারে এবং সাধারণত রিং বা গোলাকার আকারেই বেশি দেখা দিয়ে থাকে। আর এই রিং বা গোলাকার ভাব দেখেই সাধারণ মানুষ অতিসহজেই এটিকে চিনতে পারে (দাউদ), যা কিনা অন্যান্য জায়গাতে চিনতে অসুবিধা হয়।

চিকিৎসা

- যদি আক্রান্ত জায়গা অল্প হয়ে থাকে তবে যে কোন এন্টিফাঙ্গাল ক্রিম, যেমন – কেনেষ্ট্যান ক্রিম ব্যবহারেই উপকার পাবেন।
- বাইরে থেকে আসার সাথে সাথেই বিশেষ করে কুঁচকি (রানের ভাঁজ) ধুয়ে মুছে শুকনো করে রাখার অভ্যাস করতে হবে। প্রয়োজনে জাঙ্গিয়ার পরিবর্তে সুতির পাতলা, ঢোলা হাফপ্যান্ট পরতে হবে। পায়ের ক্ষেত্রে বিশেষ করে অজু বা গোসলের পর মুছে শুকনো করে রাখতে হবে। ভাল হওয়ার আগ পর্যন্ত জুতা না পরে স্যান্ডেল পরবেন।
- আক্রান্ত স্থানের পরিমাণ যদি বেশি হয়ে থাকে তবে ওষুধ খেতে হবে। তন্মধ্যে সবচেয়ে লেটেষ্ট জেনারেশনের ওষুধ যেমন–ফ্লুকোনাজোল (ক্যাপসুল ফুগাল/ ওমাসটিন)।

মাথা ও নখ বাদ দিয়ে বাদবাকি জায়গার দাউদের জন্য (50 mg) -এর ক্যাপসুল প্রতিদিন ১টি করে ৪-৬ সপ্তাহ খেতে হয়।

মাথা ও নখের চিকিৎসা একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে হওয়াই মঙ্গল। কারণ নখের ক্ষেত্রে এক বছর পর্যন্ত ওযুধ খেতে হতে পারে। মাথার ক্ষেত্রে বিশেষ চিকিৎসা ব্যবস্থা না নিলে যে টাক পড়বে, সে জায়গায় চুল পুনরায় নাও গজাতে পারে।

সাবধানতা ঃ যে কোন খাওয়ার ওষুধেই এলার্জি (অতি সংবেদনশীলতা) থাকায় ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতিরেকে খাওয়া নিরাপদ নয়। তবে লাগানোর ওষুধটি নিরাপদে লাগাতে পারেন।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

কুঁচকিতে চুলকানি ও ভেজাভাব

❒ অনেকেরই কুঁচকির দু'পাশ খুব চুলকায়, ভেজা থাকে ও সামান্য দুর্গন্ধ হয়। এ থেকে পরিত্রানের উপায় কী ?

● এ ধরনের সমস্যা থেকে পরিত্রানের জন্যে একটি অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরী। সেটা হলো যখনই আপনি বাসায় আসবেন, অর্থাৎ প্যান্ট ও আন্ডার ওয়্যার খোলার সাথে সাথেই প্রথম কাজটি হচ্ছে বাথরুমে গিয়ে পরিষ্কার পানি দিয়ে কুঁচকি ধুয়ে তারপর শুকনো কাপড় দিয়ে জায়গাটা মুছে ফেলা। এ অভ্যাসটি সারাজীবন চালু রাখতে হবে। এছাড়া Micosone cream নামক ওষুধটি রাতে শোবার সময় মাসখানেক মাখলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। মলম ব্যবহারে না কমলে চিকিৎসকের পরামর্শে মুখে খাওয়ার ওষুধ খেতে হবে। এছাড়া আক্রান্ত স্থানটি শুষ্ক রাখার চেষ্টা করতে হবে। সিনথেটিক অন্তর্বাস পরিহার করতে হবে। প্রতিদিন তা বদলাতে হবে।

পায়ের আঙুলের ফাঁক ভেজা

❒ অনেকেরই পায়ের আঙুলের ফাঁক ভেজা ভেজা থাকে। দু' আঙুলের মধ্যস্থান সাদাটে হয়ে যায়। এজন্যে করণীয় কী ?

● সব সময় জুতো পরে থাকলে পা ঘামতে পারে। দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলতে থাকলে অনেকের পায়ের আঙুলের ফাঁকে ছত্রাক সংক্রমণ ঘটে। এ সমস্যার জন্যে আক্রান্ত স্থানটি এন্টি ফাংগাল ক্রিম লাগাতে হবে। পা শুকনো রাখতে হবে। চিকিৎসাকালীন সময়ে জুতো খুলে রাখতে হবে। সুতির মোজা পরতে হবে।

ছুলি সমস্যা

❒ কারো কারো শরীরে বার বার ছৌদ বা ছুলি হয়। এর কোন স্থায়ী সমাধান আছে কি ?

● ছৌদের জন্যে দায়ী যে ছত্রাক তা প্রতিটি মানুষের ত্বকেই থাকে, তবে সবারই অসুখ হিসেবে দেখা দেয় না। যাদের এই ছত্রাকের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তাদেরই এটা রোগ হিসেবে দেখা দেয়। সুতরাং একবার যাদের ছৌদ হয় তাদের বারবার হবার আশংকা থাকে। তবে যখন এটা হবে তখন Selsun শ্যাম্পু গোসলের ১০ মিনিট আগে মেখে, সপ্তাহ দু'য়েক গোসল করলে ছৌদ ভালো হয়ে যাবে। প্রতিবারই হওয়ার পর ধৈর্যসহকারে এই চিকিৎসা নিতে হবে।

শাড়ির বাধনে কোমরে ঘা

❒ অনেক মহিলার কোমরে শাড়ি আটকানোর অঞ্চল জুড়ে ঘা'র মতো হয়। কিছু কিছু স্থান কালচে রং ধারণ করে। স্থানটি খুব চুলকায়। এ থেকে পরিত্রানের উপায় কী ?

● কোমরে শাড়ি বা সালোয়ার আঁট সাঁট করে বাঁধার জন্যে ত্বকের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ে। দীর্ঘ সময় ধরে ত্বকের উপর চাপ-পড়ার কারণে ডার্মাটাইটিস বা ত্বকের প্রদাহ হয়। বেশিদিন ধরে এই প্রদাহ স্থায়ী হলে তা একজিমায় পরিণত হয়। কাজেই কোমরে আঁট সাঁট করে শাড়ি পেঁচানো যাবেনা কিংবা খুব টাইট করে সালোয়ারের ফিতা আটকানো যাবেনা। কোমরের বাঁধন ঢিলেঢালা করে রাখতে হবে। ঘা যুক্ত স্থানে এন্টিবায়োটিক ক্রিম লাগাতে হবে। এছাড়া চুলকানির জন্যে এন্টিহিস্টামিন ওষুধ খাওয়া যেতে পারে।

শ্বেতীর চিকিৎসা আছে কি ?

❒ শরীরের দু'একটি জায়গা যেমন হাত, পা, ঠোঁটে সামান্য শ্বেতীরোগ দেখা দিয়েছে। এর কোন কার্যকরী চিকিৎসা পদ্ধতি আছে কি ?

● শ্বেতী রোগের চিকিৎসা অনেকভাবে করা যায়। তবে তা নির্ভর করে রোগের স্থায়িত্বের উপর। শ্বেতীর খুব বেশি কার্যকরী কোন চিকিৎসা পদ্ধতি নেই। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় এ রোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব হতে পারে 'লিভামিজল' নামক ওষুধ সেবনের মাধ্যমে। এটি এক ধরনের কৃমির ওষুধ। তবে ওষুধটি একটু বেশি মাত্রায় গ্রহণ করতে হয় বলে চর্ম বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে খাওয়াই ভাল। বিস্তার বন্ধ হওয়ার পর ত্বকের সাদা দাগ ওষুধ প্রয়োগে স্বাভাবিক করার চেষ্টা করা হয়। এসব কিছুর জন্য রোগীকে ধৈর্যশীল হওয়া দরকার।

শ্বেতীর বিস্তার প্রতিরোধে

❒ অনেক শ্বেতীরোগীর চিকিৎসাক্ষেত্রে Meladinine. Placentrex ইত্যাদি ব্যবহারের পরেও রোগ দ্রুত বেড়ে যায়। এক্ষেত্রে সমাধান কী ?

● যদি Meladinine কিংবা Placentrex ব্যবহারের পরেও শ্বেতী বেড়ে যায় তাহলে কোনো কোনো ক্ষেত্রে Levamisol নামক ওষুধ (এক ধরনের কৃমির ওষুধ) নির্দিষ্ট নিয়মে খেলে শ্বেতীরোগের বিস্তার রোধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে ওষুধটি শুরু করতে হয় এবং ওষুধ চলাকালীন অবস্থাতেও বিভিন্ন পরীক্ষা করিয়ে নিতে হয়।

শ্বেতী কি ছোঁয়াচে ?

❒ শ্বেতী রোগকে অনেকেই সংক্রামক বা ছোঁয়াচে ভেবে ভয় পান। শ্বেতী রোগীর সঙ্গে কোলাকুলিতে করমর্দনে অর্থাৎ স্পর্শে কি এই রোগ অন্যের মাঝে ছড়ানোর আশংকা আছে ?

● না কোলাকুলি, করমর্দন বা কোন ধরনের সহাবস্থানে এই রোগ একজন থেকে অন্য জনে ছড়ায় না। এরোগ কোন জীবাণু দ্বারা হয়না। সুতরাং সংক্রমিত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। কাজেই শ্বেতী রোগীকে অযথা ভয় পাওয়ার কিছুই নেই।

হাতের চামড়া ওঠা

❒ অনেকেরই হাতের আঙুলের চামড়া ফেটে উঠে যায়। এটাকি আর্সেনিকের বিষক্রিয়া না অন্যকিছু।

● না, আর্সেনিকের প্রভাবে চামড়া ফাটেনা। এটা হতে পারে সোরিয়াসিস, কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস বা অন্য কোনো চর্ম সমস্যায়। এ রকম হলে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা নেয়াই উত্তম।

অতিরিক্ত হাত পা ঘামা

❒ অনেকের হাত পা অতিরিক্ত ঘামে -এর চিকিৎসা ব্যবস্থা কি ?

● যাদের হাত পা অতিরিক্ত ঘামে, তাদের একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এ সমস্যাটি থেকেই যায়। হাত পা ঘামা বন্ধ করার স্থায়ী কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। ২০% এ্যালুমিনিয়াম ক্লোরাইড হেক্সাহাইড্রেট ইন এ্যালকোহল নামক ওষুধটি একটি নির্দিষ্ট নিয়মে ব্যবহার করে ভালো থাকা যায়। এক নাগাড়ে এক মাস রাতে শোয়ার সময় এই মলমটি হাতে পায়ে মেখে শুতে হবে। পরবর্তীকালে এক সপ্তাহে একবার মাখতে হবে। ওষুধটি ব্যবহারে কিছুটা জটিলতা আছে বিধায় তা ব্যবহারের আগে একজন চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেয়া বাঞ্ছনীয়।

অতিরিক্ত ঘাম

ঘাম উৎপাদনকারী গ্রন্থি বা গ্ল্যান্ড শরীরের অন্যান্য স্থানের চেয়ে হাত-পায়ে একটু বেশি পরিমাণেই থাকে। স্বাভাবিক মাত্রা বা ফিজিওলজিক্যাল লিমিট পর্যন্ত ঘামটা কিন্তু জরুরী। অন্যথায় হাত-পা বেশি শুষ্ক হয়ে চামড়া ফেটে যাবে, শক্ত হয়ে থাকবে। তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঘামা কাম্য নয়। হাত-পা অতিরিক্ত ঘামা অনেকেরই সমস্যা। হাত-পা এমনকি সমস্ত শরীর ঘামার বিস্তর কারণ রয়েছে।

❒ জ্বর এবং জ্বর ভাল হওয়ার পর কয়েক মাস পর্যন্ত শরীর বেশি ঘামতে পারে। ম্যালেরিয়া, যক্ষ্মা, অতিরিক্ত অ্যালকোহল পান, উপর্যুপরি বমি, ডায়াবেটিক নিউরোপ্যাথি, রক্তে শর্করার পরিমাণ নেমে গেলে, অতিরিক্ত মোটা শরীর, মহিলাদের ক্ষেত্রে মাসিক বন্ধ হওয়ার পর থেকে, থাইরয়েড গ্রন্থির অধিক কার্যকারিতা, পিটুইটারি গ্রন্থির অধিক কার্যকারিতা, এমনকি কখনও কখনও

ক্যান্সার জাতীয় অসুখের কারণে অতিরিক্ত ঘাম হয়ে থাকে। এছাড়া আবহাওয়ার অতিরিক্ত তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা, বেশি ব্যায়াম, গর্ভ অবস্থায়, পারকিনসন্স ডিজিজ, ফিওক্রোমোসাইটোমা এবং এসপিরিন জাতীয় ওষুধ অতিরিক্ত সেবনেও সমস্ত শরীর ঘামতে পারে।

❐ শুধু হাত-পা ঘামে এমন কারণের মধ্যে আছে মানসিক দুশ্চিন্তা, ভয়। মানসিক কারণে হাত পা ছাড়া বগল ও কুঁচকিও ঘেমে থাকে।

হাত-পা ঘামার বিভিন্ন পর্যায়

❐ লাগাতার বা কন্টিনিউয়াস ঘাম বেশি হয় গ্রীষ্মকালে।

❐ ক্ষণে ক্ষণে হাত-পা ঘামাটা মানসিক কারণের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

❐ অটোসোমাল ডমিন্যান্ট বা বংশগতভাবেও অনেকের হাত-পা ঘামে।

❐ শীতকালে পা ঘামার সমস্যাটি প্রায় সবারই। এর কারণ হচ্ছে নির্দিষ্ট স্থানের অতিরিক্ত তাপমাত্রা। যেহেতু শীতকালে জুতা ও মোজা প্রায় সারাদিনই পরতে হয় বলে সেখানকার তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে পা ঘেমে যায়। এ সময়ে অতিরিক্ত ঘামাটা সমস্যা নয়। সমস্যা হচ্ছে দুর্গন্ধ। দুর্গন্ধযুক্ত ঘাম হওয়াকে বলে ব্রোমহাইড্রোসিস। ঘামে ব্যাকটেরিয়ার উপস্থিতিই এই দুর্গন্ধের কারণ।

❐ গ্যাস্ট্রেটরি হাইপার হাইড্রোসিস- এক্ষেত্রে অতিরিক্ত মসলা জাতীয় খাবার, টম্যাটো, সস্, চকোলেট, চা-কফি ইত্যাদি খাওয়ার পর ঠোঁট, কপাল, বুকের মধ্যস্থানে অতিরিক্ত ঘামের সৃষ্টি হয়।

অতিরিক্ত ঘাম এবং চিকিৎসা পদ্ধতি

সমস্ত শরীর ঘেমে থাকলে সেক্ষেত্রে মেডিসিন বিশেষজ্ঞের পরামর্শে চিকিৎসা করানোই ভাল। এক্ষেত্রে বেশকিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার দরকার হতে পারে। মানসিক কারণের সঙ্গে সম্পর্কিত ঘাম দূর করার জন্য মানসিক সমস্যাগুলো নির্ণয়ে সচেষ্ট হতে হবে এবং তা থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে। সাধারণত ২৫ বছব বয়সের পর নিজে থেকেই এ সমস্যা দূর হতে থাকে। যদিও কোন চিকিৎসাই অতিরিক্ত ঘাম সম্পূর্ণ নিরাময়ে সক্ষম নয়, তবে 'আয়ান্টো-ফরেসিস' নামক চিকিৎসা ব্যবস্থায় কোন ধরনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ছাড়া অনেক দিন ভাল থাকা যায়। পায়ের দুর্গন্ধ দূর করার জন্য মোজা ঘন ঘন বদলাতে হবে। এছাড়া পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট মেশানো হালকা বেগুনি রঙের কুসুম গরম পানিতে প্রতিদিন প্রায় ৩০ মিনিট করে কয়েকদিন পা ভিজিয়ে রাখলে অবস্থার উন্নতি হবে। তবে একাধারে ২ সপ্তাহের বেশি এভাবে ভেজাবেন না এবং পানির রং গাঢ় বেগুনি করবেন না।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

ডান হাতের ত্বক কুঁচকে যাওয়া

❐ কারো কারো ডান হাতের চামড়া কুঁচকে যায় কিন্তু বাম হাতের চামড়া ঠিক থাকে। এর কারণ কি ? সমাধানই বা কি ?

● এর কারণ হলো আপনি যদি ডান হাতি হন তাহলে বাম হাতর তুলনায় ডান হাত

পানির সংস্পর্শে বেশি আসে। উদাহরণ স্বরূপ তিন বেলা আহারের সময়। অতিরিক্ত পানি ব্যবহার কারো কারো ক্ষেত্রে ত্বককে শুষ্ক করে কুঁচকে দেয়। আহারের পরে সাবান ব্যবহারও ত্বকের কুঞ্চনে ভূমিকা রাখে। সেক্ষেত্রে আপনি পানি ব্যবহার করে সাথে সাথেই (হাত মোছার পর হাত শুকিয়ে যাবার আগেই) ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারে উপকার পাবেন। ময়েশ্চারাইজার হিসাবে গ্লিসারিন ভালো কাজ করে। গ্লিসারিনের অতিরিক্ত আঠা ভাব হাতে ভেজা কাপড় আলতো ভাবে চেপে ধরে মুছে নিতে পারেন।

ঘাড় ও গলার ত্বক কালচে

❐ কোনো কোনো মহিলার ঘাড় ও গলার রং, গায়ের রং থেকে ভীষণ কালো। এর প্রতিকার কি ?

● ঘাড়, গলা, বগল ইত্যাদি জায়গা শরীরে তুলনায় বেশি কালো হওয়ার মূল কারণ হলো অতিরিক্ত মোটা হওয়া। এক্ষেত্রে ওজন কমালে দাগ ভালো হয়ে যাবে। এছাড়া ঘাড় ও গলা সূর্যালোকের জন্যেও কালো হয়। সেক্ষেত্রে রোদে বেরোনোর আগে নিয়মিত সানস্ক্রীন ক্রিম মেখে বের হতে হবে।

হাত ও পায়ের শুষ্ক খসখসে ত্বক

❐ অনেকের ছোটো বেলা থেকেই হাত ও পায়ের চামড়া কুঁচকানো ও খসখসে থাকে। কী উপায় অবলম্বন করলে এর সঠিক প্রতিকার পাওয়া যাবে ?

● যেহেতু সমস্যাটি ছোট্ট বেলা থেকেই, তাই এটি বংশগত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। সেক্ষেত্রে একজন চর্ম বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নিশ্চিত হয়ে নেয়া ভালো। তবে হাত ও পায়ের চামড়া কুঁচকানো ও খস্‌খসে ভাব দূর করার জন্যে নিয়মিত হাত পা ধোয়ার পর মুছে সাথে সাথেই ভেসিলিন ও গ্লিসারিন একত্রে মিশিয়ে লাগানো যেতে পারে। রাতে শোবার আগে এ অভ্যাসটি করে নিতে পারলে খুবই ভালো হয়। এছাড়া গোসলের পর গ্লিসারিন পানিতে মিশিয়ে সারা শরীরে মেখে দেয়া যেতে পারে। নিয়মিত এটি ব্যবহারে ত্বকের শুষ্কভাব দূর হবে।

ত্বকের ফাটা দাগ ও বিভ্রান্তি

গর্ভধারণ এবং সন্তান প্রসবের পর তলপেটের ত্বকে সাদাটে লম্বা লম্বা দাগ দেখা দেয়। এ জাতীয় সমস্যাকে বলা হয় স্ট্রায়া গ্রেভিডেরাম। শতকরা ১০০ জনের ক্ষেত্রেই কম বেশি এ সমস্যা দেখা দেবে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্তন, উরু এবং বাহুর উপরিভাগেও এ জাতীয় দাগ দেখা দিতে পারে।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখনই যখন অবিবাহিতাদের ত্বকে এ জাতীয় দাগ দেখা দেয়। তখন এ জাতীয় সমস্যাকে বলা হয়–ট্রায়া ডিসটেন্সি। সাধারণ মানুষের বদ্ধমূল ধারণা যে, শুধু মাত্র গর্ভধারণের ফলেই এ জাতীয় সমস্যা দেখা দেয়। এই কারণে জনমনে সন্দেহ দেখা দেয় যে, তাহলে কি মেয়ের চরিত্র খারাপ ? বাসর ঘরেই স্বামী হয়ে ওঠে

নববিবাহিত স্ত্রীর প্রতি সন্দিহান। স্বামী অতি ভদ্রলোক হয়ে থাকলে কিছু জিজ্ঞাসা করবেন না বটে, তবে মনে মনে সন্দেহ ও দুঃখবোধে ডুবে যাবেন। আর যদি ভদ্রলোক না হয়ে থাকেন তবে তো সংসারই ভেঙ্গে যাবে।

ঠিক এ জাতীয় ধারণার কারণে অবিবাহিতার আত্মীয়রা উদ্বিগ্ন হয়ে চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হন। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই এ সম্পর্কে একটা সঠিক ধারণা দেয়ার চেষ্টা করা হলো।

প্রথমে আসা যাক কেন এবং কি কারণে এ জাতীয় দাগ হয়। ত্বকের ইলাস্টিসিটি (টান দিলে লম্বা হওয়া এবং ছেড়ে দিল পূর্বের অবস্থানে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা) রক্ষা করার জন্য এক ধরনের ফাইবার থাকে, যার নাম ইলাস্টিক ফাইবার। একটা রাবার বা ইলাস্টিককে টান দিলে যেমন লম্বা হয় এবং একটা পর্যায়ে অতিরিক্ত টানের ফলে ছিঁড়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে ত্বকের ইলাস্টিক ফাইবারেরও একটা ক্ষমতা আছে যা ত্বকের চেয়ে বেশি প্রসারিত হলে ছিঁড়ে যায়।

যেমনটি হয় গর্ভধারণের পরে, পেট বড় হয়ে যাওয়ায় ত্বকের ইলাস্টিক ফাইবার তখন ছিঁড়ে যায় এবং ছিঁড়ে গিয়ে দু'পাশে চলে যায় এবং মাঝের খালি জায়গাটিই তখন দাগ আকারে দেখা দেয়। যেহেতু এ সমস্যা গর্ভধারণের ফলে হচ্ছে, তাই চিকিৎসার বিজ্ঞানের পরিভাষায় এটাকে বলা হয়– স্ট্রায়া গ্রেভিডেরাম। 'স্ট্রায়া' মানে দাগ। 'গ্রেভিডেরাম' মানে গর্ভধারণ সম্পর্কিত।

অবিবাহিতাদের ক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটে তা হচ্ছে হঠাৎ অতিরিক্ত মোটা হয়ে যাওয়া বা হঠাৎ অতিরিক্ত লম্বা হলে ত্বকের ইলাস্টিক ফাইবারগুলো ছিঁড়ে যায় এবং এ জন্য এটাকে বলে–স্ট্রায়া ডিসটেন্সি। 'স্ট্রায়া' মানে দাগ। 'ডিসটেন্সি' মানে বর্ধিত হওয়া। সুতরাং ফাটাদাগ সৃষ্টিতে গর্ভধারণই একমাত্র কারণ এটা ঠিক নয়। যে কোন কারণে ত্বকে হঠাৎ অতিরিক্ত বর্ধনের ফলে দাগ দেখা দিতে পারে। এটাই বিজ্ঞানসম্মত কথা।

ছেলেদের ক্ষেত্রেও হঠাৎ লম্বা বা মোটা হওয়ার কারণে এ জাতীয় দাগ দেখা দেয়। কিন্তু ছেলে তো আর গর্ভধারণ করেনি। তারও তো এই দাগ হলো! কাজেই শুধু গর্ভধারণের সঙ্গেই এই দাগ সম্পক্ত নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন কারণ ছাড়াই বা পারিবারিক প্রবণতা থাকে এ জাতীয় দাগ হওয়ার। সুতরাং এ নিয়ে ভুল বোঝার আর অবকাশ নেই।

এখন আসা যাক এর চিকিৎসা ব্যবস্থা কি ? না, এর কোন কার্যকরী চিকিৎসা নেই অর্থাৎ হয়ে যাওয়া দাগ দূর করার কোন ওষুধ নেই। যদি অনেক ধরনের ক্রিম এই দাগ দূর করার দাবী করছে। এই দাবী ঠিক নয়। তাই এটাকে মেনে নিতেই হবে। তবে একটা সময়ে দাগ কিছু কম অনুভূত হতে পারে। কিন্তু সম্পূর্ণ চলে যাবে না।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

মহিলার বুকে ও পেটে ফাটা দাগ

❒ সন্তান জন্মদানের পর অনেক মহিলার বুকে ও পেটে ফাটা দাগ দেখা দেয়। এই দাগ নির্মূল করার উপায় আছে কি ?

- সাধারণত গর্ভধারণের সময় শরীরের বিভিন্ন জায়গা অতিরিক্ত মোটা হওয়াতে ত্বকের ইলাস্টিক ফাইবার ছিঁড়ে যায় এবং লম্বা লম্বা দাগ পড়ে। ঠিক একই ভাবে গর্ভধারণ ছাড়াও হঠাৎ যদি কেউ মোটা হয় তাহলেও ইলাস্টিক ফাইবার ছিঁড়ে গিয়ে একই রকম দাগ পড়ে। এ ধরনের দাগ সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব না হলেও তাকে কিছুটা কমানো সম্ভব। এক্ষেত্রে চর্ম বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে ব্যবস্থা নিতে হবে।

বহু ও উরুর ত্বকে ফাটা দাগ

- ❐ বেশ কিছুদিন ধরে যদি বাহু ও রানের ত্বকে লম্বাটে ডোরা ডোরা সাদা দাগ দেখা দেয় তাহলে কি এটাকে কোন রোগ বলে ধরে নিতে হবে ?

- এ জাতীয় সমস্যাকে 'স্ট্রায়া ডিসটেনসী' বলে। হঠাৎ লম্বা হওয়া বা হঠাৎ মোটা হওয়াতে অনেকের ত্বকের ইলাস্টিক ফাইবার ছিঁড়ে যায় এবং এ ধরনের দাগের সৃষ্টি হয়। এই দাগ কোন সমস্যার সৃষ্টি করবে না। তাই চিকিৎসারও দরকার নেই। এছাড়া এই দাগ দূর করার বিশেষ কোন চিকিৎসা ব্যবস্থাও নেই। তবে একটা সময়ে নিজে থেকেই কমে যেতে পারে।

আর্টিকেরিয়া বা পিঁপড়াবাত

Urticaria বা পিঁপড়াবাত বলতে কি বুঝায় তা কমবেশি সবারই ধারণা আছে। তবুও সাধারণভাবে বুঝতে গিয়ে একটি উদাহরণ দেয়া যাক। যেমন-কেউ চিংড়ি মাছ, বেগুন, গরুর মাংস ইত্যাদি খাবার খাওয়ার সাথে সাথেই শরীর চুলকাতে থাকে এবং জায়গায় জায়গায় চাকা চাকা হয়ে ফুলে যেতে থাকে। এই ফুলে ফুলে যাওয়াটাকেই আর্টিকেরিয়া বলে।

চিংড়ি, ইলিশ, গরুর মাংস, বেগুন ইত্যাদি খাবারে আর্টিকেরিয়া হয় বলে সবারই ধারণা আছে। তবে এর বাইরে অনেক খাবারেই এমনটি হয়ে থাকে। কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে এক, দুই অথবা বড় জোর তিন প্রকারের খাবারে পিঁপড়াবাত হতে পারে। সব ধরনের খাবারেই পিঁপড়াবাত হয় এমন অভিযোগ অনেকে করে থাকেন। এটি ঠিক নয়, এটা সম্পূর্ণ মানসিক ব্যাপার।

সাধারণ মানুষের ধারণা নেই এমন কিছু খাবারের নাম দেয়া হলো যা থেকে পিঁপড়াবাত হতে পারে। তবে একটি জিনিস মনে রাখতে হবে যে, একই জাতীয় খাবার থেকে সবারই পিঁপড়াবাত হবে না। যে দু'এক জনের কপাল খারাপ তাদেরই হয়ে থাকবে, হয়তবা পৃথিবীর সবচেয়ে মজাদার মাছ 'ইলিশ' ই সেই দুর্ভাগা ব্যক্তি খেতে পারছেন না।

নারিকেল, কলা, মিষ্টি কুমড়া, পুঁইশাক, টমেটো, রসুন, পিঁয়াজ, বাদাম, চকলেট, চিজ, শুয়োরের মাংস, পাউরুটি, সস্, ভিনেগার, মদ, কোক, পেপসি, ফান্টা, জেলি, কাস্টার্ড, পুডিং কেক, ব্যাঙের ছাতা ইত্যাদি আরও অনেক খাবারে এমনটি হতে পারে।

ধরা যাক, চিংড়ি মাছ খাওয়ার পর কারও শরীরে পিঁপড়াবাত দেখা দিয়েছে। চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলেন। চিকিৎসক বললেন, চিংড়ি মাছ আব কখনও খাবেন না। রোগী এটি মানতে চান না। বলেন যে, আমার বয়স ৫০ বছর। এত জীবন চিংড়ি খেয়েছি কোন সমস্যা হয়নি। এখন হবে কেন। হ্যাঁ তাই, কোন খাবার অনেক দিন খেতে খেতে অতিসংবেদনশীলতার সৃষ্টি হয় (সবার ক্ষেত্রে নয়), আর একবার এই অতিসংবেদনশীলতার সৃষ্টি হলে পরবর্তীতে ঐ জাতীয় খাবার খাওয়ার সাথে সাথেই আর্টিকেরিয়া বা পিঁপড়াবাত হয়ে থাকে। সুতরাং ঐ জাতীয় খাবার আর খাওয়া চলবে না।

খাবার ছাড়াও আরও অনেক কারণে পিঁপড়াবাত হতে পারে। যেমন—

ক) কিছু কিছু ওষুধ সেবনেঃ পেনিসিলিন, এসপিরিন, কোট্রাইমক্সজিল, ভিটামিন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বড়ি ইত্যাদি।

খ) নিঃশ্বাসের সাথে শ্বাসনালীতে যায় এমন জিনিসঃ ঘাসের ময়লা (Grass pollen), পাখির পালক, ধূলা, বালি, তুলা (cotton seed), গবাদিপশুর ময়লা (Animal dander), এরোসল, কসমেটিক, ফুলের রেণু।

গ) দাঁতে পোকা, (caries), ক্রনিক টনসিল ইনফেকশন, ক্রনিক গলব্লাডার ইনফেকশন, ক্রনিক সাইনাস ইনফেকশন, পেটে কৃমি, ফাইলেরিয়া ইত্যাদি অবস্থাতে আর্টিকেরিয়া হয়।

ঘ) অতিরিক্ত মানসিক চাপ।

ঙ) সূর্যের আলো, অতিরিক্ত ঠাণ্ডা ও গরম।

চ) যে কোন তাপমাত্রার পানি (গোসলের সময়)।

ছ) কখনও কখনও ব্যায়াম করার পর পর।

জ) মশা, মাছি, ছারপোকা, মৌমাছি ইত্যাদির কামড়।

এতসব কারণের ভিতর আর্টিকেরিয়ার একটি প্রকারভেদকে (মেডিক্যাল ইমার্জেন্সি) এনজিও ইডিমা বলে। এমতাবস্থায় ঠোঁট, চোখের পাপঁড়ি ফুলে যায়। পেটব্যথা শুরু হতে পারে এবং আস্তে আস্তে শ্বাসকষ্ট বেড়ে যেতে পারে। এক পর্যায়ে শ্বাস বন্ধ হয়ে রোগী মারা যেতে পারে। যদি চোখের পাপড়ি, ঠোঁট ফুলে যায় তবে দেরি না করে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের শরণাপন্ন হবেন।

এ ছাড়া শরীরের অন্যান্য জায়গায় আর্টিকেরিয়ার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে এন্টি হিস্টামিন যেমন— ট্যাবলেট এলাট্রল/সেট্রিন (১০ মিঃ গ্রাম)-এর ১টি ট্যাবলেট খেয়ে নেবেন, যদি চুলকানি না কমতে থাকে তবে এক ঘন্টা পর আরও ১টি খেয়ে নেবেন।

যদি প্রতিদিনই এ অবস্থা হতে থাকে তবে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থা নিলে ভাল হয়।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

গোসলের পর শরীরে চুলকানি

❐ গোসল করার পর অসহ্যরকম গা চুলকায় অনেকের। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ?

● এই ধরনের সমস্যা ধীরে ধীরে কিছুদিন পর ঠিক হয়ে যায়। এ নিয়ে মন খারাপ করার কিছু নেই। তবে সাময়িকভাবে এন্টি হিস্টামিন জাতীয় ওষুধ যেমন ট্যাবলেট সিটিন ১০ মি.গ্রা ১টি করে রাতে ১-২ মাস খাওয়াতে উপকার পাওয়া যেতে পারে।

সব চুলকানিতে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেতে হয় না

শরীর চুলকানো একটি প্রতিদিনের সমস্যা। শরীর একটু চুলকালেই অধিকাংশ লোক এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ যেমন –হিস্টাসিন, এন্টিহিস্টা, হিস্টাল, এভিল ইত্যাদি খেয়ে থাকেন। এসব এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ সব ধরনের চুলকানিতে কার্যকর নয়। কিন্তু অনেকেই যে কোন চুলকানিতে এন্টিহিস্টামিন ওষুধ নিজে নিজে খেয়ে ফেলেন। এটি মোটেও ঠিক কাজ নয়। চুলকানোর কারণ না জেনে অযথা এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেয়ে কোন লাভ নেই। এতে ওষুধগুলোর অপচয় হচ্ছে।

শরীর চুলকানোর অনেক কারণ রয়েছে। আবার অন্যদিকে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ হিস্টামিনের বিপরীতে কাজ করে। শরীর বিশেষ কিছু বিরূপ পরিবেশের মুখোমুখি হলে রক্তে হিস্টামিন নামক এক ধরনের পদার্থ বেরিয়ে আসে। হিস্টামিন নামক এই পদার্থটি শরীরে চুলকানির উদ্রেক করে থাকে। সাধারণ অ্যালার্জিজনিত কারণে শরীরে হিস্টামিনের আগমন ঘটে এবং শরীর চুলকায়। কাজেই যে সব চুলকানি হিস্টামিনের কারণে হয় শুধুমাত্র সেসব ক্ষেত্রেই এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ কার্যকরী হবে। অন্য কারণে শরীর চুলকালে সেক্ষেত্রে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ বিশেষ কোন কাজে আসবে না। শরীর চুলকায় অথচ এন্টিহিস্টামিনের কোন ভূমিকা নেই তেমন কিছু পরিস্থিতির উদাহরণ তুলে ধরা হলো—

ডায়াবেটিসের কারণে ত্বক শুষ্ক হয়ে গেলে, মানসিক কারণে কিংবা চকলেট কফি খেলে এড্রিনার্জিক আর্টিকেরিয়া দেখা দেয়, অতিরিক্ত পরিশ্রম ও অতিরিক্ত তাপমাত্রায়, রৌদ্রের প্রভাবে চুলকালে বা সোলার অর্টিকেরিয়া হলে, রক্তশূণ্যতা, অবস্ট্রাকটিভ জণ্ডিস, কিডনির দুর্বল কার্যকারিতার ফলে রক্তে ইউরিয়ার পরিমাণ বেড়ে গেলে, কিছু কিছু চর্মরোগে প্যারাক্সিসমাল পুরিটাস বা হঠাৎ চুলকানি হলে, গর্ভাবস্থায়, শীতকালে অতিরিক্ত গোসল ও সাবান ব্যবহার, মাথা চুলকালে, কৃমি, ফাঙ্গাস ও ব্যাকটেরিয়ার জন্য পায়ুপথ এবং পথের আশপাশে চুলকালে।

উল্লেখিত চুলকানিতে এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেলে কোন লাভ হয় না। কাজেই চুলকালেই এন্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ খেতে হবে এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। এন্টিহিস্টামিন সব চুলকানির বিরুদ্ধে কার্যকর ওষুধ নয়।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

স্ক্যাবিস বা ছোঁয়াচে খোসপাঁচড়া

❒ অনেকের শরীরে এক ধরনের ছোট ছোট বিচির মতো ওঠে যে গুলো খুব চুলকায়। বিচিগুলো পানির মতো পদার্থ দিয়ে পূর্ণ থাকে। এক পর্যায়ে ঘায়ের মত হয়। এগুলো হাতে, আঙুলের ফাঁকে, নিতম্বে বেশি হয়। এ থেকে মুক্তির উপায় কী ?

● স্ক্যাবিস নামের চর্মরোগ থেকে এ সমস্যার উৎপত্তি। এজন্যে লট্রিক্স ক্রিম (পারমেথ্রিন ৫%) গোসলের পর শরীর মুছে মুখমণ্ডল ও গোপনাঙ্গ ছাড়া সারা শরীরে মাখতে হবে। ক্রিমটি লাগানোর পর ৮ থেকে ২৪ ঘন্টা রেখে গোসল করে ফেলতে হবে। ব্যবহৃত ও সংস্পর্শে আসা সব কাপড় চোপড়ও সাবান দিয়ে ভালো করে ধুয়ে ফেলতে হবে। বাড়িতে অন্য কারো এ রোগ থাকলে তাদেরকেও একই চিকিৎসা দিতে হবে। প্রয়োজনে ৭ দিন পর একই চিকিৎসা পুনরায় নিতে হবে অনেক সময় খোস পাঁচড়া পেঁকে গিয়ে থাকলে এক কোর্স এন্টিবায়োটিক মুখে খেতে দেয়া হয়। রোগটি খুব ছোঁয়াচে। স্ক্যাবিস চিকিৎসা না করালে জটিল হয়ে কিডনির ক্ষতি করতে পারে। কাজেই খোসপাঁচড়াকে হলেকা করে দেখার উপায় নেই।

কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা

❒ কেউ কেউ মনে করেন কুষ্ঠরোগ ভালো হয় না। ধারণাটি কতটুকু সত্য ?

● ধারণাটি মোটেই সত্য নয়। কুষ্ঠরোগ চিকিৎসা করালে অবশ্যই ভালো হয়। এর চিকিৎসা দীর্ঘ মেয়াদী। কোনো সময় ১ থেকে ২ বছর, কখনো ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত চিকিৎসা চালাতে হয়। তাই ধৈর্যহীন হয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থায় বিরতি দিলে অসুবিধা হয়। ওষুধগুলোর কিছু পার্শ্ব প্রতিক্রিয়াও আছে। এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে 'ড্যাপসন' নামক যে ওষুধটি কুষ্ঠরোগে খেতে হয় তা যদি ভুলক্রমে ৪৮ ঘণ্টা খাওয়া না হয় তবে ওষুধটি আর কাজে নাও লাগতে পারে। কিন্তু এটিই আবার কুষ্ঠরোগের মূল ওষুধ। এছাড়া চিকিৎসাকালীন যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে তার জন্যেও আলাদা চিকিৎসা দরকার। কাজেই চিকিৎসার জন্যে চর্ম বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে থেকে চিকিৎসা নিতে হবে।

প্রতিদিন সাবান ব্যবহার প্রসঙ্গে

❒ প্রতিদিন গায়ে সাবান মেখে গোসল করলে ত্বকের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা আছে কি ?

● সেবাম নামক এক প্রকার তেল জাতীয় পদার্থে প্রতিনিয়ত আমাদের ত্বকে নিঃসৃত হতে থাকে। এই সেবাম আমাদের ত্বককে মসৃন রাখে এবং জীবাণু রোধেও সহায়তা করে। অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারে ত্বকে সেবামের পরিমাণ কমে যায়। ফলে ত্বক শুষ্ক হয়ে যায়, বিশেষ করে শীত কালে।

ত্বকে মাইক্রো ইনজুরির সৃষ্টি হয়, অতি সহজেই জীবাণু বাসা বাঁধতে পারে। কখনো কখনো শুষ্কতার জন্যে ত্বক চুলকাতে থাকে এবং চুলকাতে চুলকাতে একজিমা হয়ে যায়। তাই বিনা প্রয়োজনে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহার ঠিক নয়। প্রতিনিয়ত সাবান ব্যবহার প্রয়োজন হতে পারে কুঁচকি, বগল ও মাথার ময়লা পরিষ্কারের জন্যে। তাও সেটা সবার বেলায় প্রযোজ্য নয়। যারা কাজ কর্মে খুব ব্যস্ত থাকেন, শরীরে প্রচুর ময়লা জমে থাকে কেবল তাদের বেলায় প্রযোজ্য। ত্বকে ডলা বা ঘসা দিলে যে ময়লাভাব দেখা দেয় সেটি সবক্ষেত্রে ময়লা নয়। আমাদের ত্বক প্রতিনিয়ত বদলাতে থাকে। এগুলো সেই মরা চামড়া যা ওঠানোর ও প্রয়োজন নেই। যদি ওঠাতে হয়ই তবে শরীরে পানি ঢেলে হাত বা কাপড় দিয়ে ডলা দিলেই উঠে আসবে। যদি সত্যি সত্যিই শরীরে ময়লা জমে তাহলে সাবান ব্যবহারতো করতেই হবে, তবে প্রতিদিন দরকার নেই।

চুলে তেল ব্যবহার প্রসঙ্গে

কালো চুলের প্রতি অধিকাংশেরই দুর্বলতা রয়েছে। তাই চুলের রং একটু বাদামী হলে বা চুল পেকে গেলে অনেকেই চুল কালো করার জন্য তেল ব্যবহারের কথা ভাবেন। কিন্তু চুল পাকা রোধ করতে তেলের কোন ভূমিকা নেই। সাধারণভাবে ত্রিশোর্ধ বয়স থেকেই ২/১টি করে চুল পাকতে থাকে। তবে যে কোন বয়সে ২/১ টি পাকা চুল থাকতে পারে। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কিছু নেই। চুলের লালভাব দূর করার ব্যাপারে তেলের ভূমিকা বলার আগে একটি বিষয় জানা দরকার। আর তা হচ্ছে তেল ব্যবহারেই কখনও কখনও চুল লাল হয়ে যায়। তেলের এসিড চুলের চক্‌চকে স্তরকে ক্ষয় করে ফেলে। তবে যতদিন তেল মাখা চলতে থাকে ততদিন এই ক্ষয়ভাব বোঝা যায় না। তেল মাখা বন্ধ করলেই সেই ক্ষয়ভাব দৃশ্যমান হয় এবং চুল লালচে দেখায় ও জট বাঁধতে শুরু করে। তখন চুল স্বাভাবিক করতে গিয়ে আবার তেল মাখতে হয়। এভাবে চলতে চলতে এক পর্যায়ে মনে হয় তেল ছাড়া যেন একদিনও চুলের সৌন্দর্য ধরে রাখা সম্ভব নয়। এভাবেই তেলের ওপর নির্ভরশীলতা তৈরি হয়। তবে তেল মাখা বন্ধ করে কয়েক মাস যদি ধৈর্য ধরা যায় তবে দেখা যাবে তেল ছাড়াই চুল আবার সুন্দর কালো হয়ে যাচ্ছে। সাময়িক রুক্ষতা দূর করার জন্য মাঝে মধ্যে বিভিন্ন হেয়ার ক্রীম ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে একটি কথা–কোন তেলে এসিডের মাত্রা যদি কম থাকে সে ক্ষেত্রে এই ক্ষতি অনেকটাই কম হবে।

সাবানে এলার্জি

❐ কারো কারো যে কোনো গায়েমাখা সাবান মাখলেই শরীর চুলকায়। এর সমাধান কী ?

● এক্ষেত্রে সর্বোত্তম চিকিৎসা হচ্ছে গায়ে সাবান না মাখা। যদি সাবান মাখাটা একান্তই প্রয়োজনীয় হয় তাহলে যে সাবানে ক্ষার বা এ্যালকালির পরিমাণ খুবই

কম বা নেই বললেই চলে (Neutral soap) এমন সাবান যেমন- Dove Soap ব্যবহারে চুলকানির উদ্রেক হওয়ার সম্ভাবনা কম হতে পারে। তবে অভ্যাস করতে হবে যথা সম্ভব সাবান না মেখে। সাবান না মাখলে শরীরের ত্বকের কোনো ক্ষতি হয়না।

কসমেটিক এলার্জি

❐ অনেকের মুখ তৈলাক্ত ধরনের। বিভিন্ন কসমেটিক্স ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু মুখমণ্ডল চুলকাতে থাকে। চুলকানো জায়গা লালাভ হয়ে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ?

● মুখে ব্যবহৃত বিভিন্ন ক্রিম বা প্রসাধনী থেকে এ ধরনের এলার্জির উদ্রেক হতে পারে। এক্ষেত্রে ঐ সব কসমেটিক্স বর্জন করে কোলাজেন ইলাস্টিন ক্রিম অথবা সেলেক্স সি ক্রিম ব্যবহার করা যেতে পারে। যথাসম্ভব ধুলাবালি ও সূর্যালোক এড়িয়ে চলতে হবে। প্রয়োজনে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে। ত্বকের তৈলাক্তভাব দূর করার জন্যে নিউট্রেজেনা বা ডোভ সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া যেতে পারে।

খাবারে এলার্জি

❐ অনেকের গরুর মাংস খেলে কিংবা ইলিশমাছ খেলে গায়ে চুলকানি বা এলার্জি হয়। একই খাবারের প্রতি কি সবার এলার্জি থাকতে পারে ?

● একেক জনের একেক খাবারের প্রতি এলার্জি থাকতে পারে। কারো বেগুনে, কারো দুধে আবার কারো মাংসে বা মাছে এলার্জি থাকে। একই খাবারে সবার এলার্জি থাকে না। এলার্জি উদ্রেককারী খাবার গ্রহণের আগে বা পরে এন্টিহিস্টামিন ওষুধ খেয়ে নেয়া যেতে পারে। তবে সমস্যা বেশি হলে ঐ সব খাবার না খাওয়াই ভালো।

ইমিটেশন গহনায় এলার্জি

❐ অনেক মহিলা আছেন যাদের হাতে কিংবা কানে ইমিটেশনের গহনা পরলে সেই স্থানের ত্বকে ফুসকুঁড়ি ওঠে, চুলকায়। এর সমাধান কী ?

● এ সমস্যার নাম 'কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস'। এ থেকে রক্ষা পেতে হলে প্রথম কাজ হচ্ছে ইমিটেশনের গহনা ব্যবহার না করা। আর ব্যবহারের পর সমস্যা দেখা দিলে আক্রান্ত স্থানে জেনথোমাইসিন-এইচসি ক্রিম সপ্তাহ খানেকের জন্যে লাগানো যেতে পারে।

স্যান্ডেলে এলার্জি

❐ পায়ে স্যান্ডেল পরলেই অনেকের পা লালাভ চাকার মতো ফুলে ওঠে। চুলকায়। পায়ে স্যান্ডেল না পরে কীভাবে চলা যায় ?

● এ সমস্যাটির নাম 'কনট্যাক্ট ডার্মাটাইটিস'। স্পর্শজনিত এলার্জির কারণে এমনটি হয়ে থাকে। কৃত্রিম উপায়ে তৈরি কিছু দ্রব্য যেমন— নিকেল, রেক্সিন ইত্যাদি ত্বকের সংস্পর্শে এলে ত্বকে এলার্জি জনিত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ফলে ত্বকে প্রদাহের সৃষ্টি হয়। কৃত্রিম উপাদান দিয়ে তৈরি স্যান্ডেল পড়া ছেড়ে দিয়ে চামড়ার স্যান্ডেল পরলেই এ সমস্যা হয়তো থাকবে না।

শয়তানের খামচি

❐ কারো কারো হাতের কনুই এবং পিঠের দিকে লম্বা আঁচড় কাটার মতো দাগ হঠাৎ করেই দেখা দেয়। অনেকে একে 'শয়তানের খামচি' বলে। আসলে এটা কী ?

● চিকিৎসা শাস্ত্রে 'শয়তানের খামচি' বলে কোন কিছু নেই। হয়তো ঘুমের ঘোরে কোন কিছুর আঁচড়ে এমনটি হয়। এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই।

স্তন চুলকানো

❐ অনেক মহিলার স্তন চুলকায় ও স্তনে ছোট দানার মতো হয়। চুলকালে কষ বের হয়। তবে ব্রা না পরলে চুলকানি কমে যায়। এ অবস্থা থেকে পরিত্রানের উপায় কী ?

● এ সমস্যাটির নাম এলার্জিক কন্ট্যাক্ট ডারমাটাইটিস। এক্ষেত্রে কিছুদিন ব্রা পরা বন্ধ রাখতে হবে। সমস্যাটা চলে গেলে সুতি কাপড়ের ব্রা ব্যবহার করা যেতে পারে। ঐ সব জায়গা ঘামলে কুসুম গরম পানি দিয়ে ধুতে হবে। এলার্জির জন্যে মেড্রোলিন ট্যাবলেট ১টা করে রোজ তিনবার প্রয়োজন মতো খেতে হবে।

স্তনের বোঁটার রং পরিবর্তন

❐ অনেক মেয়েরাই প্রশ্ন করেন, তাদের স্তনের বোঁটা আগের হালকা বাদামী বর্ণ থেকে কেন গাঢ় বর্ণ ধারণ করছে ? এটি কি কোন রোগ ?

● অল্প বয়সে স্তনের বোঁটা হালকা বাদামী রংয়েরই থাকে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তা গাঢ় হতে থাকে। তবে খুব বেশি গাঢ় হলে বা অস্বাভাবিক রংয়ের হলে অবশ্যই বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিতে হবে।

স্তন একজিমা নাকি স্তন ক্যান্সার ?

স্তনে বিভিন্ন ধরনের একজিমা হয়ে থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারও হয়ে থাকে। বাংলাদেশে প্রতি বছর আনুমানিক দেড় লাখ লোক ক্যান্সার আক্রান্ত হয় যার মধ্যে ১৫%

স্তন ক্যান্সার। মেয়েদের ক্যান্সারের মধ্যে স্তন ক্যান্সারের স্থান দ্বিতীয়। কোন কোন ক্যান্সার দেখতে একজিমার মতো। চিকিৎসায় বিলম্ব যেন না হয় সে জন্যে একটু ধারণা এবং সচেতন থাকা দরকার। তবে আসল কথা, ছড়িয়ে পড়ার আগেই ক্যান্সার নির্ণয় করতে পারলে শতকরা একশ' ভাগ ক্ষেত্রে এর নিরাময় সম্ভব।

স্তনে বিভিন্ন ধরনের একজিমা

● এ্যাটপিক একজিমা

এ্যাটপিক বলতে সাধারণত যা বুঝায় তা হচ্ছে বংশগতভাবে পাওয়া এলার্জি। এ জাতীয় রোগীর নিজের অথবা বাবা-মার এ্যাজমা বা সব সময় সর্দি কাশি লেগে থাকা বা একজিমা জাতীয় সমস্যা থাকে। বিভিন্ন বয়সে বিভিন্নভাবে একজিমা দেখা দিতে পারে। যেমন বাচ্চা বয়সে গালে, হাঁটু এবং কনুই-এর ভাঁজে। বড়দের ক্ষেত্রে ঘাড়ে, চোখের আশপাশে, কপালে হাতে। শুধু স্তনের বোঁটায় একজিমা আকারেও দেখা দিতে পারে। এ সময় শরীরের অন্যান্য জায়গায় একজিমা নাও থাকতে পারে।

● নিউরোডার্মাটাইটিস

অতিরিক্ত মানসিক চাপ বা দুশ্চিন্তা থেকে শরীরের যেকোন জায়গাতে চুলকানির উদ্রক হয় এবং চুলকাতে চুলকাতে সে সমস্ত জায়গায় একজিমা হয়ে থাকে। যে সমস্ত জায়গায় এ জাতীয় একজিমা বেশি হয় সেগুলো হচ্ছে ঘাড়, পায়ের ভাঁজ, যৌনাঙ্গের চামড়া ইত্যাদি। মহিলাদের ক্ষেত্রে স্তনের বোঁটায় বা এর চার পাশের কালো জায়গাতেও মানসিক চাপের কারণে চুলকাতে চুলকাতে একজিমা হয়ে থাকে। এমতাবস্থায় হঠাৎ দৈনিক ১/২ বার চুলকানো আরম্ভ হয়। তখন না চুলকিয়ে থাকা যায় না। চুলকাতে চুলকাতে যখন ব্যথা আরম্ভ হয় তখন চুলকানি কমে যায়।

● কনট্যাক্ট একজিমা

পাশ থেকেই বোঝা যায় যে, কোন কিছুর সংস্পর্শ থেকে এ জাতীয় একজিমার সৃষ্টি হয়, যেমন- রঙিন কাপড়, খসখসে বা উলেন কাপড় বা সিনথেটিক কাপড়। এমতাবস্থায় নিপ্‌ল বা সমস্ত স্তনেই একজিমা হতে পারে। ব্রেসিয়ারের রাবার থেকেও অনেক সময় একজিমা হতে পারে।

● নিপল বা স্তন একজিমা দেখতে কেমন

স্তন একজিমায় সাধারণত ভিজে ভিজে ভাব হয়ে থাকে। কষ ঝরতে থাকে। আস্তরণ পড়ে এবং কখনো কখনো চির বা ফাটা ফাটা ভাব হয়ে থাকে। একজিমার ক্ষেত্রে একটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ (রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে) যে, দু'পাশের স্তন সাধারণত একই সময়ে আক্রান্ত হয়ে থাকে। শুধু একটি স্তন আক্রান্ত এমন ঘটনাও হয়ে থাকে তবে খুবই কম হয়ে থাকে।

● স্তন ক্যান্সার

স্তনে ক্যান্সার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। তন্মধ্যে পেজেটস ডিজিজ নামক ক্যান্সারটি গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য যে, এটি প্রায় প্রথম থেকেই চামড়াতে (নিপ্‌ল বা নিপলের আশ পাশের কালো চামড়াতে) দেখা যায় এবং সাধারণ চোখে দেখতে একজিমার মতো।

অনেকেই একজিমা মনে করে গুরুত্ব দেয় না এবং চিকিৎসা ব্যবস্থা সঠিক সময়ে না নেয়াতে ক্যান্সার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ে এবং তখন আর চিকিৎসা নেয়ার অবস্থা থাকে না।

এ জাতীয় ক্যান্সারটিও একজিমার মত চুলকাতে থাকে। একজিমার মত আস্তরণ পড়ে। কয়েক মাস বা বছর যাওয়ার পর এটিতে পরিবর্তন আসবে বা দেখে মনে হবে যে এটি একজিমা নয়, এটি ক্যান্সার। যেমন-একটু চাকা চাকা বা শক্ত শক্ত ভাব, ক্ষত বা ঘা সৃষ্টি হওয়া, নিপল একটু ভিতরে বসে বা ঢুকে যাওয়া এবং নিপলে চাপ দিলে রক্ত বা রক্তের মত পানি বের হওয়া। একটি বিষয় গুরুত্বের সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, এ জাতীয় ক্যান্সার শুধু একটি নিপলকে আক্রান্ত করে থাকে। দু'পাশের স্তনকে এক সাথে আক্রান্ত করে না। কিন্তু একজিমা দু'পাশের স্তনকে এক সাথে আক্রমন করে। তবে একজিমা শুধু এক পাশের স্তনেও হয়। সুতরাং প্রথমেই এক পাশের কোন একজিমাকে ক্যান্সার মনে করে ঘাবড়িয়ে না গিয়ে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে নেয়া মঙ্গলজনক।

যদি একজিমা হয়ে থাকে তবে সাধারণ চিকিৎসাতেই ভাল হয়ে যাবে। যদি ৩ মাসেও একজিমার কোন পবিরর্তন বা ভাল না হয় (চিকিৎসা নেয়ার পর) তখনই কেবল একজিমা নাও হতে পারে ভেবে Biopsy করে নিশ্চিত হতে হয় যে এ সমস্যাটি একজিমা না ক্যান্সার।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

স্তনে সাদা দাগ

❐ অনেক মেয়ের ১৬ বছর বয়স থেকেই স্তনে সাদা সাদা দাগ পড়ে। এই দাগগুলো দূর করার উপায় কী ?

● স্তন বা শরীরের অন্যান্য জায়গায় লম্বা সাদা সাদা দাগ পড়াকে বলে স্ট্রায়া ডিসটেন্সি। এ সম্পর্কে সাধারণের মনে ভুল ধারণা আছে যে, শুধু বিবাহিতা বা গর্ভধারিণীর ক্ষেত্রেই এটি হয়। এ ধারণা মোটেও ঠিক নয়। যারা হঠাৎ করে মোটা ও লম্বা হয় তাদেরও এমনটি হয়ে থাকে। আবার কোন কারণ ছাড়াও হতে পারে। দাগ দূর করার কার্যকর চিকিৎসা নেই। দাগ নিজে থেকে কমে যেতে পারে। তবে কোলাজেন ইলাস্টেন ক্রিম ব্যবহার করলে লাভ হতেও পারে।

নখ ভেঙ্গে যাওয়া

❐ অনেকের বুড়ো আঙুলের নখের অগ্রভাগ ক্রমশঃ সরু হয়ে ভেতরে ডেবে যেতে থাকে। ব্যথা হয়। এর চিকিৎসা কী ?

● প্রথমত নখটি অপারেশন করে তুলে ফেলে হিস্টোপ্যাথলজি পরীক্ষা করে দেখতে হবে যে নখে কি ধরনের অসুখ। এতে দুটো উপকার পাওয়া যাবে– প্রথমত.

পরীক্ষার মাধ্যমে অসুখটি নির্ণয় করা যাবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া যাবে। দ্বিতীয়ত. নতুন নখ যখন গজাবে তখন সে নখটি সম্পূর্ণ সুস্থভাবে গজাতে পারে।

নখের কোনা পাকা

❒ কারো কারো পায়ের বুড়ো আঙুলের নখের কোনা কিছুদিন পর পর পাঁকে, ব্যথা করে। এর সমাধান কী ?

● যখন এ জাতীয় সমস্যা হবে তখন এন্টিবায়োটিক যেমন cloxacilin 500mg উপাদানের ক্যাপসুল ১টি করে ৬ ঘন্টা অন্তর ৭-১০ দিন খেলে উপকার পাওয়া যায়। তবে বারবার এ ধরনের সমস্যা যাতে না হয় সেজন্যে অপারেশনের মাধ্যমে নখের কোনার মাংস বা চামড়া নামিয়ে দেয়া হয়। তখন নখ পাশের মাংসে ঢুকে এ ধরনের সমস্যার সৃষ্টি করতে পারেনা। চর্ম বিশেষজ্ঞর এর কাজটি করতে পারেন, এজন্য যেকোন হাসপাতালের বর্হি বিভাগে যোগযোগ করা যেতে পারে।

নখের গোড়া থেকে চামড়া ওঠা

❒ অনেকের নখের গোড়ার চামড়া একটু একটু করে উঠে যায় এবং নখের গোড়া ব্যথা করে। এর প্রতিকার কী ?

● এ জাতীয় সমস্যায় প্রথম যে কাজটি করণীয় তা হচ্ছে যে চামড়াটুকু উঠে আসবে তা টান দিয়ে না ছেঁড়া। নেইল কাটার দিয়ে চামড়াটি গোড়া থেকে কেটে দিতে হবে। চামড়া যেন আর না ওঠে সে জন্যে পানির কাজ শেষ হবার পর এবং রাতে শোবার সময় গ্লিসারিন বা ভেসিলিন মাখতে হবে।। কিছুদিন এ ব্যবস্থা নিলে আর এ সমস্যায় ভুগতে হবে না।

নখে সাদা সাদা দাগ

❒ কারো কারো হাত ও পায়ের নখে সাদা সাদা দাগ পড়ে। নখগুলো দিন দিন ক্ষয় হয়ে ছোট হয়ে যায়। এর প্রতিকার কী ?

● ছত্রাকজনিত কারণে এ ধরনের সমস্যা হওয়ার ঝুঁকি বেশি। নখের ছত্রাকরোগ ভালো হতে কখনো কখনো পুরো এক বছর ওষুধ খেতে হয়। তাই এক্ষেত্রে অবশ্যই চর্মবিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে তারপর ব্যবস্থা নিতে হবে। এই সব ক্ষেত্রে সাধারণত ফ্লুকোনাজল উপাদানের ক্যাপসুল প্রতি সপ্তাহে ১৫০ মিঃ গ্রা করে ১ বছর খেতে হতে পারে। তাই ওষুধ খাওয়ার আগে কিডনি ও লিভারে কোন অসুখ আছে কিনা জেনে নেয়া দরকার। নতুবা ওষুধটি শরীরের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে।

শিশ্নের অগ্রভাগে ঘামাচির মত বিচি

❒ কারো কারো পুরুষাঙ্গের অগ্রভাগের খাঁজকাটা অংশের ত্বক মাঝে মধ্যেই ফেটে যায়, কষ ঝরে, লাল লাল গুঁটি বা ঘামাচির মতো হয়। এর সমাধান কী ?

● সমস্যাটি যদি বিবাহিত পুরুষদের ক্ষেত্রে ঘটে তাহলে স্ত্রীকে Cap flugal (150mg) ১টি পর পর ২ দিন অর্থাৎ ২টি ক্যাপসুল খাইয়ে দিতে হবে। কারণ স্ত্রীর যোনিতে ছত্রাক সংক্রমনের জন্য যৌনমিলনের পরবর্তীতে পুরুষাঙ্গে এ ধরনের সমস্যা ঘটতে পারে। অন্যথায় একজন চর্ম বিশেষজ্ঞকে দেখিয়ে চিকিৎসা নিতে হবে।

অণ্ডথলিতে দানা

❒ কারো কারো অণ্ডথলিতে মসুরের ডালের মতো গোটা হয় যা চাপ দিলে সাদা পদার্থ বেরিয়ে আসে। এর চিকিৎসা কী ?

● এটি একটি সিস্ট (cyst) হবার সম্ভাবনাই বেশি। এ জাতীয় সিস্ট-এর চিকিৎসা ব্যবস্থা বিভিন্নভাবে করা যেতে পারে যেমন Electrocoagulation, cryo surgery অথবা surgical excision অর্থাৎ কেটে বাদ দেয়া। কোন পদ্ধতিটি প্রযোজ্য হবে তা এক্ষেত্রে একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞকে দেখালে তিনি তা নির্ধারণ করে দেবেন।

অন্ডকোষের ত্বকে প্রদাহ

❒ অন্ডকোষের থলি থেকে এক প্রকার দুর্গন্ধযুক্ত মরা চামড়া উঠছে অনেকদিন ধরে। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী ?

● এসব ক্ষেত্রে ভিটামিন বি-টু অর্থাৎ Riboflavin বেশ কাজে আসে। Riboflavin ট্যাবলেট দৈনিক ৩ বার করে ২ সপ্তাহ খেলে উপকার পাওয়া যয়। অন্যথায় চর্মবিশেজ্ঞকে দেখিয়ে ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

পুরুষাঙ্গে আঁচিল

❒ কারো কারো পুরুষাঙ্গে আঁচিল হয়। এজন্যে অনেকে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করান। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ছাড়া আঁচিল দূর করা সম্ভব কি ?

● হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় কখনো কখনো আঁচিল ভালো হয় বটে, তবে এর একটি বিপজ্জনক দিকও আছে – তা হলো আঁচিল ভালো না হয়ে অতিরিক্তভাবে ছড়িয়ে যেতে পারে। সুতরাং সব সময় হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আঁচিলের ক্ষেত্রে নিরাপদ নয়। Electro cautery বা cryo surgery করে এটি সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব। একজন চর্ম বিশেষজ্ঞের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি এ ধরনের চিকিৎসাপদ্ধতির মাধ্যমে আঁচিল দূর করে দেবেন।

শিশ্নে ছোঁয়াচে রোগ

❐ কারো কারো পেনিসের চামড়ায় হঠাৎ করে ২/১টি জল গোটা হয়, ৭/৮ দিনের মধ্যেই তা শুকিয়ে যায়। গোটা থাকা অবস্থায় খুব ব্যথা হয়। এজন্য করণীয় কী ?

● অসুখটি হারপিস প্রোজেনিটালিস। এটি ভাইরাস জনিত রোগ। জ্বর ঠুঁটোর মত এটিও বার বার হয়। এটি ছোঁয়াচে। তাই এ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস ত্যাগ করতে হবে। নইলে গর্ভজাত সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে। আক্রান্ত অবস্থায় ভাইরাক্স ক্রিম ২/৪ ঘণ্টা পর পর ব্যবহার করতে হবে যত দিন সেরে না যায়।

হাতের তালু চুলকানো

❐ অনেকেরই হাতের তালু চুলকায়, ছোটো ছোটো ঘামাচির মতো ওঠে এবং খোলসের সৃষ্টি হয়। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় কী ?

● রোগটির নাম পামফোলিক্স। এ জন্যে ডার্মোভেট ক্রিম দিনে ২ বার করে ৩ সপ্তাহ ব্যবহার করতে হবে। অতঃপর ওষুধটি ২ সপ্তাহ বন্ধ রেখে আবার একই ভাবে ২ সপ্তাহ ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তীতে একই সমস্যা দেখা দিলে অল্প কিছু দিন ওষুধটি ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে ইনফেকশন থাকলে এন্টিবায়োটিক লাগাতে হবে।

খুতনিতে কালোদাগ

❐ অনেকের শেভ করার ফলে খুতনির লোমকূপের গোড়াতে ইনফেকশন হয় এবং এর ফলে কালো দাগ পড়ে যায়। এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ?

● এজন্যে স্টেরয়েড জাতীয় মলম, যেমন— সিকরটেন প্লাস ক্রিমটি দিনে ২ বার করে ২১ দিন ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি উপকার হয় তাহলে মাঝখানে ১৪ দিন বন্ধ রেখে ক্রিমটি আরো ২১ দিন ব্যবহার করা যেতে পারে। আফটার শেভ লোশনের ব্র্যাণ্ড পরিবর্তন করে নেয়া ভালো। শেভ করার সময় ব্লেড উল্টো দিকে টানা ঠিক হবে না। দৈনিক শেভ না করে ১ দিন পরপর শেভ করতে হবে। সর্বদা ধারালো ব্লেড ব্যবহার করতে হবে।

মশার কামড়ের দাগ

❐ কারো কারো শরীরে মশার কামড়ের কারণে ঘা এবং দাগের সৃষ্টি হয়। এ দাগ দূর করার উপায় কী ?

● মশার কামড় থেকে সৃষ্ট সমস্যার জন্যে স্টেরয়েড মলম যেমন— ডার্মোভেট ক্রিম দিনে ২/৩ বার মোট ৭দিন লাগানো যেতে পারে। তবে এর বেশি সময় ধরে এটি ব্যবহার করা যাবে না।

আমের কষ থেকে কালো দাগ

❑ কাঁচা আমের কষ লেগে অনেকের ঠোঁটের পাশে কালোদাগ পড়ে যায়। এ সমস্যার সমাধান কী ?

● আমের কষ লেগে অনেকের ক্ষেত্রে ইরিট্যান্ট ডার্মাটাইটিস দেখা দেয়। এ জন্যে বেটনোভেট ক্রিম পাতলা করে দিনে ২ বার মোট ২ সপ্তাহ পর্যন্ত দাগের উপর লাগাতে হবে। তবে ২ সপ্তাহের বেশি এটা ব্যবহার করলে ত্বকের ক্ষতি হতে পারে। এ ছাড়া লেবু বা ভিটামিন সি খাওয়া যেতে পারে।

নবজাতকের ৬টি চর্মরোগ

জন্মের পর পরই শিশুদের কিছু কিছু চর্মরোগ দেখা যায়। যা কি-না খুব স্বাভাবিকভাবেই হয়ে থাকে অথবা অজ্ঞতার কারণেও এ জাতীয় সমস্যার সৃষ্টি হয়। শিশুর ত্বকের সঠিক পরিচর্যা, সময়মতো সঠিক চিকিৎসার মাধ্যমে অতি সহজেই এ জাতীয় জটিলতা থেকে মুক্তি পওয়া যায়।

Prickiy Heat বা ঘামাচি : দিনের তাপমাত্রা বেশি থাকা অবস্থাতেও আমাদের মা, চাচিগণ নবজাতককে চারদিক থেকে বিভিন্ন গরম কাপড়ে জড়িয়ে রাখেন এবং এর ফলে কয়েক ঘন্টার ভিতরেই ঘামাচির সৃষ্টি হয়। প্রথম পর্যায়ে যে জাতীয় ঘামাচির সৃষ্টি হয় তা দেখতে সাদা অথবা লাল রং বিশিষ্ট পানি পানি গোটা আকারে দেখা দেয়। এ জাতীয় ঘামাচি চেনার মূলমন্ত্র হচ্ছে যে, ঘামাচি কখনও লোমের গোড়াতে হয় না। ঘামাচিকে যদিও মনে হতে পারে সাধারণ ব্যাপার, কিন্তু এ থেকে অনেক জটিল সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। যেমন-এ থেকে শরীরের অনেক ফোঁড়ার সৃষ্টি হতে পারে যা সারানো একটু কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়।

আবহাওয়া যদি গরম থাকে তবে জন্মের পর শিশুকে একটু খোলামেলা রাখা উচিত। ঘরের জানালা খোলা থাকা উচিত। ঘামাচিতে যে কোন ট্যালকম পাউডারের ব্যবহারের উপকারে আসে।

Erathema Toxicum Neonatorum বা মাসিপিসি : গ্রামে মা-চাচিগণ এ জাতীয় চর্মরোগকে মাসিপিসি বলে থাকেন এবং এটি নবজাতকদের হয়েই থাকে বলে তাদের ধারণা। সত্যিই এটি খুব সাধারণ ব্যাপার। জন্মের তিন থেকে চারদিনের দিন শিশুর শরীরে লাল লাল র‍্যাশ (Rash) দেখা দেয়। এর সাথে জ্বর বা অসুস্থতার অন্য কোন উপসর্গ থাকে না। দশদিনের দিন কোন ধরনের ওষুধ ছাড়াই এটি ভাল হয়ে যায়।

Diaper Rash বা ন্যাপকিন র‍্যাশ : লেঙ্গট বা জাঙ্গিয়া পরিধানে নবজাতকের লাল লাল ভাব নিয়ে এলার্জির ন্যায় র‍্যাশ দেখা দিতে পারে। এ জাতীয় র‍্যাশ শরীরের যে সমস্ত স্থান কাপড়ের সংস্পর্শে আসে সেই জায়গায় হয়ে থাকে। অর্থাৎ উরুতে বা গাদিতে (hip) হবে, তবে উরুর ভাঁজ বা কুঁচকি বা গাদির ভাঁজে হবে না। এমতাবস্থায় কাপড় সাময়িকভাবে বর্জন করা উচিত এবং সাথে ফাঙ্গিডাল-এইচসি নামক ক্রিম দৈনিক ২ বার কিছু দিন ব্যবহারে উপকার পাওয়া যায়। একটি বিষয় এখানে জরুরী, যে সমস্ত বাচ্চার ন্যাপকিন সারা রাতে একবারও বদলানো হয় না তাদেরই এ সমস্যাটি বেশি হয়ে থাকে।

এ ক্ষেত্রে পায়খানাতে অবস্থিত জীবাণু ও প্রস্রাবের ইউরিয়া থেকে এ্যামোনিয়া তৈরি করে এলার্জির সৃষ্টি হয়।

Candidiasis বা ফাঙ্গা : নবজাতকের মুখের ভিতর বিশেষ করে জিহ্বাতে দুধের সরের মতো আস্তরণ দেখা দেয়। সুস্থ সবল শিশুর ক্ষেত্রেও এ জাতীয় সমস্যা দেখা দিতে পারে। মা-চাচীগণ এ জাতীয় সমস্যায় নরম কাপড়ে সরিষার তেল লাগিয়ে ঘষে পরিষ্কার করার চেষ্টা করে থাকেন। এত জিহবা পরিষ্কার হতে এবং ফাঙ্গাস হওয়ার সম্ভাবনা কমে আসে। নিস্ট্যাট ড্রপ আক্রান্ত স্থানে কয়েক ফোঁটা দৈনিক ৩/৪ বার লাগিয়ে দিলে কয়েকদিনের মধ্যেই এ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

যে সমস্ত জায়গা সব সময় ভিজা থাকে, যেমন— কুঁচকি, পায়খানার রাস্তার আশপাশ, গলার ভাঁজ, সে সমস্ত জায়গাতেও Candida দিয়ে ইনফেকশন হতে পারে। এ ক্ষেত্রে আক্রান্ত স্থানের চামড়া লাল লাল ভাব হয়ে যায় এবং এর ওপর সাদা সাদা ছোপ দেখা দেয় এবং প্রচণ্ড চুলকায়। এ থেকে মুক্তি পেতে হলে আক্রান্ত স্থানকে অবশ্যই শুকনো রাখতে হবে। পেভারিল ক্রিম দৈনিক ১/২ বার আক্রান্ত স্থানে মাখলে উপকার পাওয়া যায়।

Cradle Cap বা মাথায় খুশকির মতো : কোন কোন নবজাতকের মাথায় হলুদ অথবা বাদামী রঙের খোসা বা চামড়া পুরু হয়ে জমতে দেখা যায়। কখনও কখনও বাজে গন্ধ হয় এবং তেলতেলে ভাব দেখা যায়। এটি ৬ মাস বয়সে নিজে থেকেই ভাল হয়ে যায়। সাময়িকভাবে পরিষ্কারের জন্য অলিভ অয়েল বা অয়েলাটাম রাতে মেখে সকালে গোসল করতে পারেন।

Scabies বা পাঁচড়া : চুলকানি, খোস পাঁচড়া ছোঁয়াচে রোগ। নবজাতককে একবার কোলে নেয়ার জন্য আত্মীয়স্বজন সবাই অধীর আগ্রহে অপক্ষো করতে থাকে। এর ভিতর একজনের যদি সামান্য খোস-পাঁচড়াও থাকে তা অতি সহজেই নবজাতককে আক্রান্ত করে। প্রতিটি আঙ্গুলের ভাঁজে, কব্জিতে, হাত ও পায়ের তালুতে, বগলে, নাভি, যৌনাঙ্গে গাল এমনকি সমস্ত শরীরে ছোট ছোট গোটা আকারে চুলকানি দেখা দেয়। অতিসত্ত্বর একজন চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে এর চিকিৎসা নেয়া উচিত। কারণ খোস-পাঁচড়াগুলো থেকে কখনও কখনও কিডনি আক্রান্ত হতে পারে।

ক্রিম ব্যবহারের নিয়ম

শীতে মুখের তথা ত্বকের শুষ্কতা দূর করার জন্য চাই কোল্ড ক্রিম। অনেকে মনে করেন যে কোন একটা ক্রিম হলেই হলো। আসলে তা নয়। ত্বকের শুষ্কতা দূর করার জন্য শীত মৌসুমে এমন ধরনের ক্রিম বা লোশন দরকার যাতে রয়েছে অধিক গ্লিসারিন এবং পেট্রোলেটাম। গ্লিসারিন ত্বকের অন্তস্থ পানিকে বাষ্পীভূত হতে দেয় না ফলে ত্বকের আর্দ্রতা বজায় থাকে। এছাড়া গ্লিসারিন নিজেও ত্বকে আর্দ্রতা দেয়। আর পেট্রোলেটাম ত্বকের ভিতরকার আর্দ্রতাকে ধরে রাখে ত্বকের ওপর একটি হালকা আবরণ তৈরির মাধ্যমে। এতে ত্বক থেকে আর্দ্রতা নির্গমনের পথ বন্ধ হয়ে যায়, ত্বক থেকে পানি বেরিয়ে যেতে পারে না। একটু ভাল ক্রীমে আরও থাকে মিনারেল অয়েল, ভিটামিন সি এ এবং

ই, প্রোপেলিন গ্লাইকল, সলিউবল কোলাজেন এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক বনজ নির্যাস। এসব ক্রিম ত্বকের বুড়িয়ে যাওয়া ভাবকে প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং ত্বক সজীব রাখে। অনেকে শীতে ভ্যানিশিং ক্রিম ব্যবহার করেন, এটা ঠিক নয়। এতে ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা হয় না। ক্রিম লোশন কিংবা ময়েশ্চারাইজার বা আদ্রতাকারক প্রসাধন ব্যবহারে একটা নিয়ম রয়েছে। গোসল সেরে আসার পর শরীর তোয়ালে দিয়ে মুছে নেয়ার পরপরই এসব প্রসাধন ব্যবহার করা উচিত। গোসলের সময় শরীরের ত্বক কিছু পানি শুষে নেয়, শুষে নেয়া সেই পানিটুকুকে দীর্ঘ সময় ত্বকের মধ্যে বন্দী করতে পারলেই ত্বক সজীব থাকবে। আর তাই ত্বকের বাহ্যিক পানিটুকু মুছে নেয়ার পরপরই সেখানে কোল্ডক্রিম, লোশন কিংবা ময়েশ্চারাইজার লাগাতে হবে। এতে ত্বক অধিক সজীবতা পাবে। ক্রিম মাখতে দেরি হলে ত্বকের পূর্ব সঞ্চিত পানি বাতাসে উবে যায়, ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়ে। এরকম অবস্থায় ক্রিম মাখলেও উপকার আছে তবে বাড়তি আর্দ্রতা পাওয়া যায় না। এসব দামী প্রসাধনের পরিবর্তে সাধারণ গ্লিসারিন পানিতে মিশিয়েও শরীরে লাগালে কাজ হবে। ভেসিলিন বা পেট্রোলিয়াম জেলিও মুখে, হাতে, পায়ে ব্যবহারে একই উপকার পাওয়া যাবে। দামী প্রসাধনের চেয়ে এগুলো খুব বেশি কম কার্যকরী বলা যাবে না। শরীরের যে কোন স্থানের শুষ্কতা দূর করতে আর্দ্রতার জন্য নির্দ্বিধায় এগুলো প্রয়োজন মতো ব্যবহার করুন। বাড়তি উপকারের জন্য নিয়ম মেনে ব্যবহার করুন। এছাড়া ত্বকে বারবার সাবান ব্যবহার করবেন না। শীতে গ্লিসারিন যুক্ত সাবান কিংবা অধিক চর্বিযুক্ত সাবান ব্যবহার করুন।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

শীতে ত্বক ফাটে কেন ?

❒ শীত এলে ত্বক শুষ্ক হয়ে ফেটে যেতে চায়। শীতের সময় ত্বকের এই নাজুক অবস্থা কেন দেখা যায় ?

● শীতের সময় বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে কম থাকে। ফলে পরিবেশ অনেক শুষ্ক থাকে। শুষ্ক পরিবেশ সবসময়ই আর্দ্রতা শুষে নিতে চায়। এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রেও তাই হয়। শুষ্ক পরিবেশ মানুষের ত্বক থেকে আর্দ্রতা হরণের প্রক্রিয়ায় ত্বক থেকে জলীয় পদার্থ শুষে নিয়ে যায়। এ ছাড়া ত্বকের বাইরের স্তরে চর্বি জাতীয় উপাদানের (লিপিড) মিশ্রণে তৈরি আবরণ থাকে। ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় ত্বকের এই আবরণও কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়ে। আর বয়স্কদের ক্ষেত্রে সেই আবরণটি এমনিতে দুর্বল হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে ত্বকের বর্হিভাগে চর্বিজাতীয় উপাদানের আবরণটি ত্বকের অভ্যন্তরে পানির যাওয়া আসাকে নিয়ন্ত্রণ করে। শীতের সময় ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়ার কারণে ত্বকের বাইরের সেই চর্বি উপাদানের আবরণ আণুবীক্ষণিক পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে এই আণুবীক্ষণিক পথে দিয়ে ত্বকের অভ্যন্তরস্থ পানি শুষ্ক পরিবেশের আকর্ষণে বেরিয়ে আসে। আর তাই শীতের সময় একটুতেই শরীরের নাজুক ত্বক, যেমন-

ঠোঁট, হাত-পা, মুখমণ্ডল শুষ্ক খড়খড়ে হয়ে ফেটে যেতে থাকে। শরীরের অন্যান্য অঞ্চলের ত্বক ততটা নাজুক নয় বলে তা আর একটু অযত্নেই ফেটে যায় না। তবে কিছুটা শুষ্ক তো হয়ই।

শীতে ঠোঁট কেন ক্ষতিগ্রস্ত হয় ?

❒ শীতের সময় ঠোঁট যতটা অত্যাচার সহ্য করে শরীরে অন্য কোন অংশ বোধহয় ততটা করে না। শীতের আঘাতে ঠোঁট সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয় কেন ?

● ঠোঁট একটি আকর্ষণীয় ও কমনীয় নাজুক অঙ্গ। শরীরের অন্যান্য অঞ্চলের ত্বক মোটামুটি পনেরটির মত আণুবীক্ষণিক স্তর নিয়ে গঠিত। ঠোঁটের ক্ষেত্রে সেরকম স্তর রয়েছে মাত্র তিন থেকে পাঁচটি। ফলে ত্বকের প্রতিরক্ষা কিছুটা কম থাকে। এই স্বল্প প্রতিরক্ষার কারণে শীতের বা ঠাণ্ডা শুষ্ক আবহাওয়ায় ঠোঁট সবার আগে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একটু ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়াতেই ফেটে চৌচির হয়ে যায়। আকর্ষণীয় ঠোঁট তখন আকর্ষণহীন ও যন্ত্রণার কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

ঠোঁটের দুর্বল গঠন

❒ শীত ছাড়া বছরের অন্যান্য ঋতুতেও ঠোঁট শরীরে অন্যান্য স্থানের ত্বকের তুলনায় একটু শুষ্কই রয়ে যায়। এটাও কি ঠোঁটের ত্বকের দুর্বল গঠনের জন্য হয়, নাকি আরো কিছু কারণ রয়েছে ?

● শরীরের অন্যান্য স্থানের ত্বকের তুলনায় ঠোঁটের ত্বক গঠনগতভাবেই কিছুটা নাজুক। এছাড়া ঠোঁটে কোনো তৈল গ্রন্থি বা চর্মগ্রন্থি নেই, নেই ত্বকের রঞ্জক পদার্থ (মেলানিন) উৎপাদনকারী কোষ। কাজেই ঠোঁটে আর্দ্রতা ও কোমলতা রক্ষার জন্য ঠোঁটের নিজস্ব কোনো ব্যবস্থা নেই। এছাড়া রোদের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ঠোঁটের নিজস্ব কোন ক্ষমতা নেই। এছাড়া শরীরের অন্যান্য অঞ্চলকে যেমন কাপড়-চোপড় দিয়ে আবৃত করে শীতের প্রভাব থেকে রেহাই দেয়া যায়, ঠোঁটের ক্ষেত্রে তা সম্ভব নয়। কাজেই সাধারণ পরিবেশেই ঠোঁটের অবস্থা একটু ঝুঁকিপূর্ণ থাকে আর শীতের সময় সেই ঝুঁকি একটু বেশি থাকে।

শীতে ঠোঁটের সুরক্ষা

❒ শীতের আঘাত থেকে ঠোঁটকে রক্ষা করতে হলে করণীয় কী ? ঠোঁট রক্ষার এই ব্যবস্থা কি আগে থেকে নেয়া ভাল ?

● শীতের আক্রমণ থেকে নাজুক ঠোঁটকে রক্ষা করতে হলে ঠাণ্ডা ও শুষ্ক আবহাওয়া এবং ঠোঁটের উপরিভাগ–এই দুইয়ের মাঝে বাধার দেয়াল তৈরি করতে হবে। এই বাধার দেয়াল তৈরির জন্য ঠোঁটের উপরিভাগে তৈলাক্ত উপাদানের স্তর লেপ্টে দিতে হবে। শীতের শুরুতেই ঠোঁট শুষ্ক হতে থাকে এবং এক সময়ে ঠোঁটের চামড়া উঠতে উঠতে তা ফাটা শুরু করে। ঠোঁটে এই

ধরনের যন্ত্রণাদায়ক বাজে অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই প্রতিরোধক ব্যবস্থা নেয়া শুধু ভালই নয় উত্তম বলে গণ্য করা যেতে পারে।

ঠোঁটে শীতের প্রসাধন

❒ ঠোঁটের সুরক্ষার জন্য শীতের শুরুতেই ঠোঁটে কী কী প্রসাধন ব্যবহার করা যেতে পারে ?

● শীতের শুরুতেই ঠোঁটে শুষ্কভাব দেখা দেয়াব সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁটের উপর পেট্রোলিয়াম জেলির আবরণ দিতে হবে। ঠোঁটের আর্দ্রতা রক্ষার জন্য অর্থাৎ শুষ্কতা রোধ করার জন্য বিভিন্ন রকম প্রসাধন রয়েছে। প্রসাধনগুলো হচ্ছে— লিপজেল, চ্যাপস্টিক, ভেসিলিন বা পেট্রোলিয়াম জেলি, গ্লিসারিন–যা ব্যবহারে সহজেই ঠোঁট স্বাভাবিক থাকে।

যাদের ঠোঁট বেশি ফাটে

❒ যাদের ঠোঁট একটু বেশি ফাটে তাদের ক্ষেত্রে করণীয় কী ?

● ঠোঁট একটু বেশি ফাটার প্রবণতা থাকলে বা বেশি শুষ্ক হয়ে থাকলে লিপজেল, চ্যাপস্টিক, ভেসিলিন/পেট্রোলিয়াম জেলি, গ্লিসারিন ইত্যাদি বারবার ঠোঁটে লাগাতে হবে। অর্থাৎ সব সময়েই ঠোঁটে উল্লেখিত প্রসাধনের কোনোটি লাগিয়ে রাখতে হবে। কাজেই যেসব কারণে ঠোঁটের প্রসাধন মুছে যেতে পারে যেমন— কোনো কিছু পান করা, খাওয়া দাওয়া, গোসল ইত্যাদির পর ঠোঁটে আলতোভাবে ভেসিলিন/ প্রেটোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন লাগিয়ে দিতে হবে। রাতে শোবার আগে এইসব ব্যবস্থা গ্রহণ করলে বেশ উপকার পাওয়া যায়।

ঠোঁটে আর্দ্রতারক্ষক প্রসাধন লাগানোর নিয়ম

❒ ঠোঁটের আর্দ্রতারক্ষক উপকরণ যেমন— ভেসিলিন/গ্লিসারিন কখন লাগানো সবচেয়ে ভাল ?

● ঠোঁটের আর্দ্রতারক্ষক বা শুষ্কতারোধক উপকরণ বা প্রসাধন ঠোঁট কিছুটা আর্দ্র ভেজা-ভেজা ভাব থাকা অবস্থাতেই লাগানো ভাল। এ সময় ঠোঁটের মধ্যে শোষিত পানিটুকু সঞ্চিত অবস্থায় থাকে। কাজেই তখন ঠোঁটে ভেসিলিন/গ্লিসারিন লাগালে সঞ্চিত পানিটুকু সঞ্চিত অবস্থায়ই থাকে। শুষ্ক পরিবেশ ঠোঁটের ত্বকের সঞ্চিত পানিকে আর শুষে নেয়ার সুযোগ পায় না। গোসলের পর কিংবা কোন কিছু পান করার পর ঠোঁট টিস্যুপেপার, রুমাল কিংবা তোয়ালে দিয়ে আলতো করে চেপে বাড়তি পানি মুছে নিয়ে তখনই ভেসিলিন/গ্লিসারিন লাগালে ঠোঁটের মধ্যে পানি সঞ্চিত অবস্থায় থাকবে এবং ঠোঁটে বাড়তি সজীবতা আসবে। কিন্তু ঠোঁট শুষ্ক হওয়ার পর ঠোঁটে ভেসিলিন/গ্লিসারিন লাগালে ঠোঁটের শুষ্কতা দূর হবে তবে ঠোঁটে বাড়তি সজীবতা থাকবে না।

শীতে ঠোঁট লিপস্টিক প্রসঙ্গে

❒ শীতের সময় ঠোঁটে লিপস্টিক ব্যবহার করলে কি ঠোঁটের কোন ক্ষতি হয় ?

● শীতের সময় ঠোঁটে লিপস্টিক দেয়ার একটা সুবিধা আছে। কারণ কিছু কিছু লিপস্টিকে ভেসিলিন জাতীয় পদার্থ থাকে। যা ঠোঁটকে আর্দ্র রাখতে সাহায্য করে। তবে ম্যাট জাতীয় লিপস্টিক থেকে এই সুবিধা পাওয়া যাবে কি-না বলা মুশকিল।

ঠোঁটের যত্নে কার্যকর প্রাসাধন

❒ শীতে ঠোঁটের যত্নে অনেক রকম প্রসাধন রয়েছে। এইসবের মধ্যে কোন্ ধরনের প্রসাধন ঠোঁটের জন্য অধিকতর যত্নশীল।

● ঠোঁটের যত্নের বিবেচনায় ভেসিলিন/পেট্রোলিয়াম জেলি জাতীয় প্রসাধনই অধিকতর কার্যকরী।

ঠোঁটের জন্য স্বল্পমূল্যে কার্যকর প্রসাধন

❒ অল্প দামও বেশি কার্যকারিতার বিবেচনায় কোন ধরনের প্রসাধনকে ঠোঁটের জন্য বেছে নেয়া উচিত ?

● স্বল্প মূল্যে ও অধিকতর যত্নের বিবেচনায় গ্লিসারিনকেই ঠোঁটের যত্নে প্রাধান্য দেয়া উচিত। গ্লিসারিন স্বল্পমূল্যে সবচে' ভাল আর্দ্রতারক্ষক প্রসাধন বা ময়েশ্চারাইজার।

মুখে ধুলোবালির আস্তরণ

❒ শীতের শুষ্ক পরিবেশে ঘরের বাইরে বেরুলেই ধুলোর ধূসরতা চোখে পড়ে।

ধূলিময় এই পরিবেশ মুখশ্রীকে ম্লান করে দেয়।এ অবস্থায় মুখশ্রীর সৌন্দর্যকে ফিরিয়ে আনতে করণীয় কী ?

● শীতের শুষ্ক পরিবেশ সবকিছুকে এতটাই ধূলিময় করে রাখে যে বিনা বাতাসেই চারিদিকে ধূলির ধূসরতা চোখে পড়ে। ধূলিময় এই পরিবেশ যতটা এড়িয়ে চলা যায় ততটাই ভাল। বাইরের ধূলিময় পরিবেশ থেকে ঘরে ফেরার পর মুখ সাবান দিয়ে ধুয়ে ফেলতে হবে। মুখ ধোয়ার পর টাওয়েল দিয়ে চেপে(ঘষে নয়)মুখ মুছে মুখে কোল্ড ক্রীম,ময়েশ্চরাইজার কিংবা ভেসিলিন/ গ্লিসারিন ইত্যাদির যে কোনটি মুখে লাগিয়ে নিতে হবে। এতে মুখের সৌন্দর্য অটুট থাকবে।

মুখে বারবার সাবান দেয়া কি ঠিক ?

❒ বারবার সাবান দিয়ে মুখ ধুলে শীতকালে অনেকেরই ত্বক রুক্ষ হয়ে যায়। আবার কারো ক্ষেত্রে একবার দু'বার সাধারণ টয়লেট সোপ দিয়ে মুখ ধুলেই ত্বক খস্‌খসে হয়ে যায়। কাজেই ত্বকের কমনীয়তা রক্ষা করবে কিংবা ত্বককে রুক্ষতা থেকে রেহাই দেবে সে রকম কোনো সাবান আছে কি ?

● শীতের সময় বাইরের ধূলিময় পরিবেশ থেকে ধূলোমাখা মুখশ্রী নিয়ে ঘরে ফেরার পর মুখমণ্ডল পানি দিয়ে ধুয়ে নেয়া ছাড়া বিকল্প নেই। মুখ সাবান দিয়ে ধোয়ার কারণে মুখমণ্ডলের ত্বক কিছুটা রুক্ষ হয়ে যেতে পারে।বারবার সাবান দিয়ে মুখ

ধুলে কারো কারো মুখমণ্ডল আরো বেশি রুক্ষ হয়ে পড়ে। ওইসব ক্ষেত্রে মুখ ধোয়ার কাজে ময়েশ্চারাইজিং সোপ ব্যবহার করাই ভাল। এছাড়া ময়েশ্চারাইজিং ক্রিমবার ও ক্লিনজার এই দু'য়ের সমন্বয়ে তৈরি সাবানও রয়েছে। কিংবা বাথজেলও ব্যবহার করা যেতে পারে। শীতের সময় ময়েশ্চারাইজিং নিউট্রাল ধরনের সাবান ব্যবহারে ত্বকের পেলবতা রক্ষিত হয়।

ময়েশ্চারাইজিং সাবান

❐ ময়েশ্চারাইজিং যুক্ত সাবানগুলো চেনার উপায় কি ?

● সাবানের প্যাকেটের গায়েই লেখা থাকে সাবানটি ময়েশ্চারাইজিং কি-না। বিদেশি সাবানের প্যাকেটের গায়ে সাবান সম্পর্কে তথ্য দেয়া থাকে। অতিরিক্ত ক্রিম যুক্ত বা ক্রিমবার, ক্লিনজার এবং ময়েশ্চারাইজার এই বিষয় গুলো সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে সাবান বেছে নিতে হবে। সাধারণভাবে ময়েশ্চারাইজিং সাবানগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সাদা রঙের হয়ে থাকে। কাজেই গায়ে মাখা সাবান কেনার সময় ভাল কোম্পানির সাদা রঙেরটি বেছে নেয়া যেতে পারে।

রুক্ষ ত্বক পরিষ্কারের উপায়

❐ কারো কারো ত্বক এমনিতেই কিছুটা রুক্ষ। এই রুক্ষ ত্বকের মুখমণ্ডল শীতের সময় পরিষ্কার করার জন্য বারবার ধুলে আরো রুক্ষ হয়ে পড়বে। এক্ষেত্রে মুখ পরিষ্কার করার জন্য কী ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ?

● যাদের ত্বক এমনিতেই রুক্ষ তাদের ক্ষেত্রে বারবার সাবান দিয়ে মুখ ধোয়াটা ঠিক হবেনা। এক্ষেত্রে ক্লিনজার ব্যবহার করা যেতে পারে। মুখে ক্লিনজার মেখে টিস্যুপেপার বা কোমল কাপড় দিয়ে মুছে সঠিকভাবে পরিষ্কারের কাজটি করতে হবে। এছাড়া ভাল ময়েশ্চারাইজিং সাবান দিয়ে মুখ ধুলে সঙ্গে সঙ্গে তোয়ালে দিয়ে চেপে চেপে পানিটুকু শুষে নিয়ে তখনই মুখের ভেজাভাব থাকা অবস্থায় ভাল কোল্ডক্রীম বা ময়েশ্চারাইজার কিংবা গ্লিসারিন বা ভেসিলিন মেখে নিলেই ত্বক সজীব থাকবে।

ত্বকের আর্দ্রতা ছিনতাইকারী শীত থেকে সুরক্ষা

শীতে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কমে যায়। তাই ত্বকে শুষ্কতার সমস্যা হবে অনেকের। সেই সুযোগে কসমেটিক্সের দোকানে বিভিন্ন ধরনের অয়েল, ময়েশ্চারাইজের এবং ইমোলিয়েন্টের বিক্রি বাড়বে। শুষ্কতার প্রকারভেদের ওপর ভিত্তি করে এর ব্যবহার নির্ভর করে। তবে প্রথমেই যে বিষয়টি জানা দরকার তা হচ্ছে অতিরিক্ত সাবান ব্যবহারে ত্বকের তৈলাক্ত ভাব (সেবাম) কমে যায় এবং ত্বকের শুষ্কতা বেড়ে যায় বিশেষ করে শীত কালে। তাই শুষ্কতার সমস্যা যাদের আছে তারা সাবান একটু কমই ব্যবহার করবেন।

আর যদি করতেই হয় তবে বিভিন্ন ধরনের গ্লিসারিন সোপ বা ক্ষারের পরিমাণ নেই বা খুব কম যেমন Dove Soap বা Oilatum Bar ইত্যাদি ধরনের সাবান ব্যবহার করাই মঙ্গলজনক। ত্বকে যদি সামান্য শুষ্কভাব হয় তবে যে কোন অয়েল ব্যবহারই যথেষ্ট, যেমন অলিভঅয়েল বা বেবি অয়েল। শুষ্কতার পরিমাণ যদি একটু বেশি হয় তবে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহারই উত্তম। কসমেটিক্সের দোকানে বিভিন্ন নামে ময়েশ্চারাইজার পাওয়া যায়, তবে গ্লিসারিনই হচ্ছে সবচেয়ে ভাল ময়েশ্চারাইজার। ময়েশ্চারাইজার অবশ্য ত্বকে অর্থাৎ গোসলের পর শরীর মুছে ত্বকে ভেজাভাব থাকা অবস্থাতেই মেখে দিতে হবে। গ্লিসারিন মাখার ফলে সৃষ্ট অতিরিক্ত আঠাভাব অনেকের পছন্দ নয়। সেক্ষেত্রে ভেজা তোয়ালে বা গামছা কিংবা যে কোন ভেজা কাপড় চিপে নিয়ে আস্তে এবং আলতো ভাবে চেপে চেপে অতিরিক্ত আঠাভাব উঠিয়ে নেয়া সম্ভব। তবে ঘষা বা ডলা দেবেন না, তাতে পুরো গ্লিসারিনই মুছে যেতে পারে।

শুষ্কতার কারণে যদি ত্বক ফেটে চৌচির হয়ে যায়, বিশেষ করে পায়ের গোড়ালি এবং ঠোঁট, তবে ইমোলিয়েন্ট ব্যবহার করতে হবে। কসমেটিক্সের দোকানে বিভিন্ন ধরনের দামী ইমোলিয়েন্ট পাওয়া যায় –Oilatum emollient (এটি অবশ্য ওষুধের দোকানেও পাওয়া যায়)। শিশুদের ত্বকে এটি খুবই উপকারী। তবে সাধারণের জন্য সবচেয়ে ভাল ইমোলিয়েন্ট হচ্ছে ভেসিলিন। ভেসিলিন যে কোন অবস্থাতেই (শুষ্ক অথবা ভেজা ত্বক) মাখা যায়, তবে ভেজা অবস্থায় মাখলে উপকার বেশি। ঠোঁটের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে ৩ বেলা আহারের পরপরই আহারের সময় ঠোঁট অনেকক্ষণ যাবত ভিজতে থাকে এবং আহার শেষে সাথে সাথেই ভেসিলিন ঠোঁটে মেখে দিলে ভেজা ভাবটা থেকে যায় এবং ফাটা থেকে ঠোঁট রক্ষা পায়। তবে সাবধান, জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজানোর চেষ্টা করবেন না। এতে ঠোঁট ফাটা তো কমবেই না, উপরন্ত এলার্জি ভাব দেখা দেবে এবং এই এলার্জি ঠোঁটের আশপাশের ত্বক পর্যন্ত ছড়িয়ে যেতে পারে। পায়ের গোড়ালি ফাটাকে ঝামা দিয়ে ঘষে দূর করা অনেক সময় ক্ষতিকারক হতে পারে, সোরিয়াসিস-এর প্রবণতার কারণে যদি গোড়ালি ফাটে তবে অতিরিক্ত ঘষাতে সোরিয়াসিস বেড়ে যেতে পারে। তবে গোসলের সময় পায়ের গোড়ালি সামান্য ঘষে তাতে ভেজাভাব থাকা অবস্থায় ভেসিলিন মাখলে গোড়ালি ফাটবে না। শীতে পা অতিরিক্ত ঘামে। এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অলসতার কারণে প্রতিদিনের মোজা প্রতিদিন যদি ধৌত করা না হয়, রাতে ঘুমানোর আগে পা যদি ভালভাবে ধোয়ার অভ্যাস না থাকে তবে পায়ে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হবে। পায়ের বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়া এবং অতিরিক্ত ঘাম মিলে এই দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়। তাই জুতোয় গন্ধ লেগে যাওয়ার পূর্বেই মোজা বদলে নিতে হবে। পা ধুয়ে নিতে হবে। জুতোতে গন্ধ লেগে গেলে আর মোজা বদলে লাভ নেই। তখন জুতোই গন্ধের আঁধার হয়ে যাবে। যাদের অতিরিক্ত দুর্গন্ধ হওয়ার প্রবণতা থাকে তাদের ক্ষেত্রে পায়ের ব্যাকটেরিয়া নিয়ন্ত্রণে এবং ঘামভাব কমাতে পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট-এর কয়েকটি দানা হাল্কা কুসুম গরম পানিতে মিশিয়ে ২০ মিনিট তাতে পা ভেজাতে হবে, একাধারে ৭-১৪ দিন। পরবর্তীতে সপ্তাহে ১ বার পা ভেজালেই হবে। তবে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে–পানিতে পটাশের পরিমাণ যেন বেশি না হয়। পানির রং হাল্কা বেগুনি হতে হবে, অতিরিক্ত পটাশে রং গাঢ় হবে এবং তাতে ত্বক বেশি শুষ্ক হয়ে ফেটে গিয়ে এলার্জির মতো সমস্যা

হতে পারে। পায়ের গোড়ালি ফাটা রোধে শীতে কিছুটা সময় হলেও প্রতিদিন গোড়ালি ঢাকা থাকে এমন স্যাণ্ডেল বা জুতো পরা উচিত। বিশেষ করে ঘরে বাইরে ধূলিময় পরিবেশে জুতো পরলে গোড়ালিতে ময়লা লাগার সুযোগ থাকে না এবং পা বেশি শুষ্কও হতে পারে না। আর খালি পায়ে হাঁটা যাবে না। সব সময় খোলা স্যাণ্ডেল পরলেও পায়ের গোড়ালি ফাটে। পায়ে মোজাও পরা যেতে পারে। মোট কথা, শীতে ত্বককে রক্ষার জন্য ত্বক পরিষ্কার রেখে তাতে ক্রিম মেখে দিতে হবে আর হাত পা বারবার না ভেজানোই ভাল।

ভেজালে ভাল করে ধুয়ে মুছে সঙ্গে সঙ্গে ক্রিম লাগাতে হবে। এভাবেই ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করে ত্বককে সজীব রাখবে চেষ্টা করতে হবে।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

রুক্ষ ত্বকের জন্য স্বল্পমূল্যের সাবান

❒ যাদের ত্বক এমনিতেই রুক্ষ কিন্তু মুখ ধোয়ার কাজে ক্লিনজার বা দামি ময়েশ্চারাইজিং সাবান ব্যবহারের সামর্থ নেই, তারা কীভাবে মুখ পরিষ্কার করবেন?

● এই পরিস্থিতিতে মুখ ধোয়ার কাজে গ্লিসারিন সোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মুখ বার বার ধোয়া ঠিক নয়। গোসলের সময় ছাড়া সাবান দিয়ে দিনে ২ বারের বেশি মুখ ধোয়া ঠিক হবে না। তবে ৪/৫ বার শুধু পানি দিয়ে ভেজানো যাবে সাবান দিয়ে ধোয়া কিংবা শুধু পানি দিয়ে মুখ ভেজানোর পর মুখ মুছে মুখমণ্ডলে গ্লিসারিন/ভেসিলিন কিংবা কোল্ডক্রীম মেখে দিতে হবে। তবে মুখমণ্ডলের ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা কিংবা শুষ্কতা দূর করার জন্য গ্লিসারিন খুবই ভাল কাজ করে।

তৈলাক্ত মুখে শীতের যত্ন

❒ কারো কারো মুখমণ্ডল সাধারণভাবে বেশ তৈলাক্ত থাকে। শীতের সময় মুখমণ্ডল পরিষ্কারের জন্য তাদের কোনো বিশেষ যত্নের দরকার আছে কি?

● যাদের ত্বক তৈলাক্ত, শীতের সময় ত্বক সম্পর্কিত সমস্যা তাদের কম হয়। তবে বিশেষ যত্নের দরকার না পড়লেও শীতের সাধারণ যত্নের বিষয়গুলো তাদের অনুসরণ করতে হবে। যেমন— সাদা রঙের টয়লেট সোপ দিয়ে মুখ ধোয়া এবং মুখ ধোয়ার পর মুখ মুছে তখনই কোল্ডক্রীম লাগিয়ে নিতে হবে। শীতে ত্বকের সাধারণ যত্নের বিষয়ে সচেতন না হলে অর্থাৎ তৈলাক্ত ত্বক রয়েছে বলে ক্রীম ব্যবহার না করলে, মুখমণ্ডল পরিচ্ছন্ন না রাখলে মুখমণ্ডলে শীতের প্রকোপজনিত উপসর্গ ফুটে উঠবে, ত্বক রুক্ষ খসখসে হয়ে যাবে ত্বক ফাটতে শুরু করবে। কাজেই শীতে ত্বকের যত্ন নেয়া অবশ্যই দরকার।

যাদের হাত-পা বারবার ভেজাতে হয়

❒ যারা নিয়মিত নামাজ পড়েন তাদের ক্ষেত্রে ৫ বার মুখমণ্ডলসহ হাত-পা ধুতে হচ্ছে। শীতের সময় এভাবে কয়েকবার মুখমণ্ডল, হাত-পা ধোয়ার কারণে ত্বক কি অতিরিক্ত রুক্ষ হয়ে যাবে ? এই অবস্থায় কীভাবে ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা করা সম্ভব ?

● বারবার ত্বক ভেজানোর কারণে ত্বক রুক্ষ হয়ে যাবে। তবে প্রতিবার ত্বক ভেজানোর পর সেখানে অর্থাৎ ঠোঁট মুখমণ্ডল, হাত-পা ইত্যাদিতে কোল্ডক্রীম/গ্লিসারিন/ভেসিলিন ইত্যাদির যেকোনোটি মেখে নিলে ত্বক আরো বেশি সজীব হবে। কারণ দৈনিক ৪/৫ বার ওজু করার সময় ত্বক কিছুটা পানি শুষে নিচ্ছে। এই পানিটুকু ধরে রাখতে পারলে ত্বকের সজীবতা বাড়বে। ত্বকে শোষিত পানিটুকু ধরে রাখার জন্য ভেজা ত্বক মুছে তখনি আর্দ্রতারক্ষক প্রসাধন মাখতে হবে। তবে ত্বক বেশি সময় অর্থাৎ ১০-২০ মিনিটের বেশি সাধারণ পানিতে ভেজা থাকলে তা ত্বকের জন্য ভাল নয়। কারণ এতে ত্বকের উপরিভাগের প্রতিরোধক তৈলাক্ত স্তরটি নষ্ট হয়ে যায়।

মুখের প্রসাধনে এলার্জি হলে

❒ মুখমণ্ডলে প্রসাধন ব্যবহারে এলার্জি ওঠে। এক্ষেত্রে কোল্ডক্রীমের বিকল্প হিসাবে স্বল্প মূল্যে কী ধরনের প্রসাধন ব্যবহার করা যায় ?

● কোল্ডক্রীমের বিকল্প হিসেবে স্বল্পমূল্যে সবচেয়ে ভাল প্রসাধন হচ্ছে–গ্লিসারিন ও পেট্রোলিয়াম জেলি বা ভেসিলিন। চর্মবিশেষজ্ঞদের মতে বিভিন্ন কোল্ডক্রীমে যাদের এলার্জিজনিত প্রতিক্রিয়া বা উপসর্গ দেখা দেয় তাদের ক্ষেত্রেও গ্লিসারিন ও সুগন্ধিহীন পেট্রোলিয়াম জেলি নিরাপদ। পেট্রোলিয়াম জেলি ত্বকের বার্ধক্য রোধ করতেও সাহায্য করে। ত্বকের যত্নে স্বল্পমূল্যের পেট্রোলিয়াম জেলি অনেক দামি ত্বক প্রসাধনের চেয়ে উপকারী।

শীতে নাজুক ত্বকের যত্ন

❒ যাদের ত্বক বেশি রুক্ষ অর্থাৎ সামান্য শীতেই যাদের মুখমণ্ডল শুষ্ক হয়ে পড়ে, ফেটে যেতে চায় এমন ক্ষেত্রে কী ধরনের যত্ন নেয়া উচিত ?

এইসব ক্ষেত্রে মুখমণ্ডলে পেট্রোলিয়াম জেলি অথবা গ্লিসারিন মাখলে অনেক সময় ত্বকে চিটচিটে ভাব দেখা যায়। এই অবস্থায় তোয়ালে দিয়ে চেপে মুখমণ্ডল থেকে বাড়তি গ্লিসারিনটুকু শুষে নিলে অনেকটা স্বস্তি লাগবে। তবে যেকোনো ক্রীম ব্যবহারের আগে মুখ ধুয়ে নেয়া উত্তম। বাইরে থেকে ঘুরে আসার পর মুখমণ্ডলে বেশি ধূলোবালি আটকে আছে মনে করলে গ্লিসারিন সোপ/ময়েশ্চারাইজিং সোপ দিয়ে মুখ ধুয়ে এবং মুছে নিয়ে পেট্রোলিয়াম জেলি বা গ্লিসারিন আবার মুখে লাগাতে হবে।

শীতে সাধারণ ত্বকের যত্ন

❒ যাদের মুখ সাধারণভাবে তৈলাক্ত অর্থাৎ ততটা রুক্ষ নয় তারা মুখে কোন ধরনের ক্রীম মাখবেন ?

● যাদের মুখ সাধারণভাবে তৈলাক্ত তারা মুখে ভিটামিন-ই ক্রীম মেখে স্বস্তি পাবেন।এই ধরনের ক্রীমে মুখ তেলতেলে লাগবে না অথচ সজীব থাকবে। এছাড়া অন্যান্য কোল্ডক্রীম কিংবা হালকা ময়েশ্চারাইজার এক্ষেত্রে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে তৈলাক্ত ত্বকে গ্লিসারিন বা ভেসিলিন মাখার দরকার পরে না। উল্লেখ্য, ভিটামিন-ই ক্রীম ত্বকের বার্ধক্যজনিত ভাঁজ দূর করতে সাহায্য করে।

শীতে মুখমণ্ডলে প্রসাধন মাখার নিয়ম

❒ ক্রীম, ময়েশ্চারাইজার, গ্লিসারিন দৈনিক কয়বার, কখন মুখমণ্ডলে মাখা উচিত ?

● শীতে ত্বকের প্রসাধন সকালে ঘুম থেকে উঠে মুখ ধোয়ার পর, ঘর থেকে বেরুনোর আগে, দুপুরে বা সকালে গোসলের পর, বিকেলে ঘুম থেকে উঠে কিংবা বাইরে থেকে ফিরে মুখ ধুয়ে রাতে শোয়ার আগে (অবশ্যই) মুখ পরিষ্কার করে ধুয়ে (একটু বেশি করে) লাগাতে হবে। মোটামুটিভাবে দিনে ৩/৪ বার মুখমণ্ডলে শীতের ত্বক প্রসাধন লাগালেই যথেষ্ট।

ত্বকের যত্ন অলিভ অয়েল

❒ শীতে ত্বকের যত্নে অলিভ অয়েল কতটুকু কার্যকরী।

● অলিভ অয়েল শীতের ত্বকের যত্নে আর্দ্রতারোধক হিসেবে কাজ করে। মুখমণ্ডল হাত-পা সহ সারা শরীরেই এটি মাখা যায়। বিশেষ করে গোসলের পর শরীরের ঢাকা অঞ্চলে অলিভ অয়েল লাগানো যেতে পারে।

শীতে বয়স্কদের ত্বকের যত্ন

❒ শীতে মুখমণ্ডল, ঠোঁট, হাত-পা-এর যত্নে বয়স্কদের ক্ষেত্রে কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

● শীতকালে বয়স্কদের ত্বকের বিশেষ যত্ন নেয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে সামর্থ্য অনুযায়ী ভাল ময়েশ্চারাইজার কিংবা গ্লিসারিন সর্বাঙ্গে ব্যবহার করা ভাল। ঠোঁটে ও মুখমণ্ডলে ভেসিলিন লাগাতে হবে। মুখমণ্ডলে দিনের বেলা ভিটামিন-ই ক্রিম এবং রাতে গ্লিসারিন লাগানো যেতে পারে। হাতের কনুই, পায়ের গোড়ালিতে ভেসিলিন/ গ্লিসারিন মাখা ভাল। বয়স্কদের ক্ষেত্রে ত্বক কম ভিজানোই ভাল।

শীতে ত্বক মলিন হয় কেন ?

❒ শীতের সময় অনেকের চেহারা কিছুটা মলিন হয়ে যায় অর্থাৎ চেহারা কিছুটা কালো হয়ে যায়। এমনটি কেন হয় ? এক্ষেত্রে ত্বক কালো হয়ে যাওয়ার প্রবণতা থেকে রক্ষা পেতে করণীয় কী ?

- শীতের সকালে গায়ে রোদ মেখে যারা ওম পেতে চান কিংবা যারা দুপুরে, বিকেলে শীতের রোদ লাগাতে পছন্দ করেন তাদের চেহারা শীতেব ঋতুতে একটু মলিন ও কালো হয়ে যেতে পারে। কারণ শীতেব রোদ অন্যান্য ঋতুর তুলনা বেশি ক্ষতিকর। শীতের সময় আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ খুব কম থাকে। ফলে অতিবেগুনি রশ্মি (আলট্রাভায়োলেট-রে) কোনো বাধা না পেরিয়ে সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে চলে আসে। এজন্য শীতকালে অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব বেশি থাকে। বছরের অন্যান্য সময়ে রোদের প্রখরতা বেশি থাকলেও আবহাওয়ায় জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকে। এই জলীয় বাষ্প অতিবেগুনি রশ্মির অবাধ আগমণকে বাধা দেয়। অর্থাৎ অতিবেগুনি রশ্মি জলীয় বাষ্পের বাধা পেরিয়ে আসার সময় কিছুটা তেজস্ক্রিয়তা হারিয়ে ফেলে। শীতের সময় অনেকেই আরাম করে গায়ে রোদ লাগান। এ কারণে অনেকের ত্বক গাঢ় বর্ণের বা সাধারণভাবে যাকে কালো হওয়া বোঝায় সেরকম হয়ে যায়। রোদ ত্বকের জন্য সব সময়েই ক্ষতিকর। শীতকালে সেই ক্ষতির পরিমাণ আরো বেশি। অন্যদিকে গরমের সময় মানুষ তাপ সহ্য করতে না পেরে রোদ এড়িয়ে চলে এবং তখন ত্বক কালো হওয়ার সুযোগ কম থাকে। কাজেই সৌন্দর্য সচেতন সবাইকে এড়িয়ে চলতে হবে শীতের মিষ্টি রোদ। কারণ শীতের মিষ্টি রোদ আসলে মিষ্টি নয়।

শীতে ত্বকের ক্ষতির জন্য দায়ী কে ?

❑ শীতকালীন রোদে অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা বেশি থাকে বলে তা ত্বকের ক্ষতি করে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি কীভাবে ত্বকের ক্ষতি করে ?

- আলট্রাভায়োলেট রশ্মি ত্বকের কোমলতা রক্ষাকারী কোলাজেনকে ভেঙ্গে দেয়। ফলে ত্বক কুঁচকে যায় এবং সজীব ত্বক বয়সী ত্বকের রূপ ধারণ করে। এছাড়া ত্বক গাঢ় বর্ণের হয়ে যায়। আলট্রাভায়োলেট-রে বা অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ত্বকের এই ক্ষতি শুধু শীতকালেই নয় সব ঋতুতেই হয়। কাজেই ত্বকের সৌন্দর্যের স্বার্থে সব সময়েই সূর্যরশ্মি এড়িয়ে চলা ভাল। ত্বকে বার্ধক্যের ছাপ বা ভাঁজ পড়ার পেছনে শতকরা ৬০-৮০ ভাগের ক্ষেত্রে সূর্য রশ্মিকেই দায়ী করা হয়ে থাকে।

শীতে সূর্য রশ্মি থেকে ত্বকের সুরক্ষা

❑ শীতকালে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির প্রকোপ থেকে ত্বককে রক্ষার জন্য কী কী ধরনের ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে ?

- অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্য সূর্যরশ্মি এড়িয়ে চলা কিংবা ত্বককে সূর্যরশ্মি থেকে আড়াল করাই হচ্ছে আসল কাজ। সূর্যরশ্মি এড়িয়ে চলার জন্য বাইরে বেরুলে ছাতা ব্যবহার করা উচিত, রিকশার হুড তুলে রাখা উচিত, বাসে জানালার পাশে সূর্য রশ্মির সংস্পর্শে না বসে ভিতরের সিটে বসা উচিত। এছাড়া সূর্য রশ্মি থেকে ত্বককে আড়াল করার জন্য শরীরের উন্মুক্ত অংশে যেমন— মুখমণ্ডলে, হাতে, গ্রীবায় সানস্ক্রীন জাতীয় ক্রীম

লাগাতে হবে। এই সানস্ক্রীনের কার্যকারিতা ৩ ঘন্টা পর্যন্ত বজায় থাকে। তিন ঘন্টার পর আবার মাখতে হবে। আল্টাভায়োলেট রশ্মি প্রতিরোধের জন্য সানস্ক্রীনের ক্ষমতা এসপিএফ (সান প্রোটেক্শন ফ্যাক্টর) ১৫ হওয়া বাঞ্ছনীয়। এছাড়া ভিটামিন-ই ক্রিমও মৃদু সানস্ক্রীন হিসেবে কাজ করে। সানস্ক্রীন সূর্যরশ্মির কারণে ত্বকের রং পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় বাধা দেয় এবং ত্বকের স্বাভাবিক রং বজায় রাখতে সাহায্য করে।

শীতে সূর্যের রশ্মি থেকে চোখের চারিদিকের ত্বকের সুরক্ষা

❐ শীতকালে আবহাওয়ায় অতিবেগুনি রশ্মির মাত্রা বেড়ে যায়। এই অতিবেগুনি রশ্মি থেকে চোখের চারিদিকের নাজুক ত্বককে কীভাবে রক্ষা করা যায় ?

● অতিবেগুনি রশ্মি মুখমণ্ডলের ত্বকের মধ্যে সবচেয়ে নাজুক অঞ্চল অর্থাৎ চোখের চারি দিকের কোমল ত্বকে সহজেই ক্ষতিকর প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। তাই চোখের চারিদিকের ত্বককে রক্ষার জন্য চোখে সানগ্লাস পরা ভাল। এছাড়াও সানগ্লাস সূর্য রশ্মির কারণে চোখের ছানি পড়া প্রতিরোধের চেষ্টা করে। চোখের চারিদিকের কোমল ত্বকে তৈল নিঃসরণ গ্রন্থির সংখ্যা কম থাকে বলে এ অঞ্চলের ত্বকে সহজেই ভাঁজ পড়তে চায়। অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিরোধে প্লাষ্টিক লেন্সের সানগ্লাস অধিক কার্যকরী। সবুজ, বাদামি এবং কালো রংয়ের সানগ্লাসই সবচে ভাল বলে মনে করেন অনেক গবেষক। শীতের সময় সমুদ্র কিংবা পাহাড়ে বোড়নোর ধুম লাগে, এই দুই জায়গাতেই অতিবেগুনি রশ্মির উপস্থিত বেশি থাকে। কাজেই উভয় স্থানেই সানগ্লাস পরা ভাল।

শীতে গৃহিণীর হাতের ত্বকের যত্ন

❐ একজন গৃহিণী রান্নার কাজ করতে যেয়ে তাকে বারবার হাত পানিতে ভেজাতে হয়। বারবার পানিতে হাত ভেজানোর কারণে হাতের চামড়া ভেজা অবস্থায় ফুলে ওঠে। শুকালে চরম খসখসে ভাব দেখা যায় এই অবস্থায় করণীয় কী ?

● শীতের সময় কেন অন্যান্য ঋতুতেও বারবার হাত পানিতে ভেজালে ত্বক ফুলে ওঠে এবং শুকালে খসখসে হয়। তবে শীতের সময় এই সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করে। এ অবস্থায় হাত পানিতে কম ভেজাতে পারলে ভাল নতুবা প্রতিবার হাত ভেজানোর পর হাতটি তোয়ালে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে মুছে নিতে হবে এবং গ্লিসারিন মেখে দিতে হবে। আর অন্যান্য সময়ের জন্য প্রযোজ্য ত্বকের যত্নও বহাল থাকবে।

জন্মগতভাবে খসখসে ত্বক ও শীতের যত্ন

❐ একটি ছেলের বয়স ১২ বছর তার হাত, পা, মুখ এবং সারা শরীরের ত্বকই খুব খসখসে। জন্মগতভাবেই ওর ত্বক এরকম। শীতের সময় ওর ত্বক প্রচণ্ড খসখসে। হয়ে পড়ে, মুখের ত্বক ফেটে যায়। এ অবস্থায় করণীয় কী ? উল্লেখ্য, অনেক নামি দামি ত্বক প্রসাধনেও কোন উপকার হয় না।

- এই অবস্থায় ত্বকের জন্য নামি দামি নয় দু'টি সাধারণ ত্বক প্রসাধন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রসাধন দু'টি হচ্ছে অতি পরিচিত গ্লিসারিন ও ভেসিলিন। পরে হাতে শরীরের গ্লিসারিন মাখতে হবে এবং ঠোঁটে, মুখমণ্ডলে, কনুই, পায়ের গোড়ালিতে, আঙ্গুলের ফাঁকে মাখতে হবে ভেসিলিন বা পেট্রোলিয়াম জেলি। মোটামুটিভাবে সব সময়েই এগুলো মাপা অবস্থায় থাকতে হবে। খেলাধুলা জুতো পরে করবে আর খালি পায়ে হাঁটবে না, স্যাণ্ডেল/ জুতো ব্যবহার করবে।

শরীরে শীতের প্রসাধন

❒ শীতের সময় মুখমণ্ডল ছাড়াও সারা শরীর কেমন টানতে থাকে, শরীরের ত্বক খসখসে হয়। শরীরে মাখার মত কী কী ত্বক প্রসাধন আছে ?

- শরীরে মাখার উপযোগী ত্বক প্রসাধনের মধ্যে বিভিন্ন রকমের বডিলোশন, বডি ময়েশ্চারাইজার রয়েছে। এগুলো সারা শরীরের ত্বকে ব্যবহার করা যায়, এতে ত্বকের রুক্ষতা দূর হবে।

শীতে শরীরের ঝুঁকিপূর্ণ অংশের যত্ন

❒ শীতের সময় হাতের তালু, কনুই, পায়ের গোড়ালি আঙ্গুলের ফাঁক বেশি রুক্ষ হয়, এক্ষেত্রেও বডিলোশন কাজ করবে ?

- কোনটি কার ক্ষেত্রে কাজ করবে তা নির্ভর করে ত্বকের ধরনের উপর। ত্বক তৈলাক্ত হলে শীতের সময় সাধারণ বডিলোশন ব্যবহারই যথেষ্ট। সাধারণ ও রুক্ষ ত্বকে ময়েশ্চারাইজিং বডিলোশন ব্যবহার করলেই হয়। আর বেশি রুক্ষ হলে হাতের তালু, কনুই, আঙ্গুলের ফাঁকে ভেসিলিন/পেট্রোলিয়াম জেলি ব্যবহারের দরকার পড়ে।

শীতে হাতের তালু ও পায়ের গোড়ালির চামড়া ওঠা

❒ শীতের সময় অনেকেরই হাতের তালু কিংবা পায়ের গোড়ালি থেকে মরা চামড়া ওঠে। এক্ষেত্রে করণীয় কী ?

- হাতের তালুর জন্য এ অবস্থায় তালুতে সব সময় ভেসিলিন/পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে রাখতে হবে। আর হাত বারবার পানিতে ভেজানো যাবে না। কোনো কারণে ভেজাতে হলেও দ্রুত মুছে নিয়ে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগাতে হবে। আর পায়ের ক্ষেত্রে পায়ের গোড়ালি খসখসে ফ্লোরে ঘরে অথবা ঝামা দিয়ে ঘষে মরা চামড়া সরিয়ে পরিষ্কার করে নিতে হবে। তারপর সেখানে ভেসিলিন মেখে রাখতে হবে সব সময়ের জন্য। আর এক্ষেত্রে খালি পায়ে হাঁটা বারণ। পা বারবার ভেজানো বারণ। কোন কারণে ভেজাতে হলে দ্রুত মুছে নিয়ে পেট্রোলিয়াম জেলি মেখে নিতে হবে।

শীতে শরীরের ঢাকা অংশের ত্বকের যত্ন

❒ শরীরের যেসব অঞ্চল কাপড় চোপড়ে ঢাকা থাকে সেইসব অঞ্চলে সাধারণ ত্বক প্রসাধন লাগানো হয় না। কিন্তু একটু লক্ষ করলেই দেখা যায় শীত সেইসব ঢাকা অংশের ত্বককেও ক্ষমা করেনি। এক্ষেত্রে করণীয় কী ?

- শরীরে ঢাকা অঞ্চলেও উন্মুক্ত অঞ্চলের জন্য নির্বাচিত প্রসাধন ব্যবহার করতে হবে। বডিলোশন/ময়েশ্চারাইজ বডিলোশন জাতীয় প্রসাধন শরীরে ঢাকা অঞ্চলে লাগানো যেতে পারে। বিশেষ করে গোসলের পর পুরো শরীর টাওয়েল দিয়ে চেপে মুছে নিয়ে বাথরুমেই নির্বিঘ্নে এই কাজটি সম্পন্ন করা যায়।

শীতে স্বল্পমূল্যে দেহলতার ত্বকের যত্ন

❒ বডিলোশন, ময়েশ্চারাইজিং লোশনসহ দেহের জন্য প্রয়োজ্য অনেক ত্বক প্রসাধনই সাধারণের সংগ্রহের সামর্থ্যের মধ্যে নেই। এক্ষেত্রে স্বল্পমূল্যে সুলভ প্রসাধন হিসেবে কোনো কিছু আছে কি ?

- শরীরে মাখার জন্য সুলভ প্রসাধনের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে গ্লিসারিন। গ্লিসারিনের সঙ্গে পরিমাণমত পানি মিশিয়ে এটি সর্বাঙ্গে মেখে দিলে ত্বকের আর্দ্রতা রক্ষা হবে। তবে শরীরে গ্লিসারিন মাখার পর অনেক সময় চিটচিটে ভাব থাকে। সেক্ষেত্রে টাওয়েল দিয়ে চেপে চেপে ত্বকের উপর জেগে থাকা বাড়তি গ্লিসারিনটুকু শুষে নিতে হবে। যাদের ১টি বা ২টি বডিলোশন/ময়েশ্চারাইজিং লোশন কেনার ক্ষমতা আছে তারা ১টি বডিলোশন পরিমাণে দ্বিগুণ করে ব্যবহার করতে পারেন। যেমন কিছুটা পানি ফুটিয়ে ঠাণ্ডা করে তাতে পরিমাণ মত গ্লিসারিন মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নেবেন। তারপর লোশনের একটি খালি বড় বোতলে গ্লিসারিন যুক্ত পানি ও নতুন বডিলোশন সমপরিমাণ মিশিয়ে ভাল করে ঝাঁকিয়ে নিলে যে নতুন লোশনটি তৈরি হবে সেটি ব্যবহার করুন। এক্ষেত্রে লাভ হচ্ছে অল্প খরচে লোশনের পরিমাণ বাড়লো, লোশন সুগন্ধযুক্ত হলো ও গ্লিসারিনের চিটচিটে ভাব দুর হল।

শরীরে শীতের প্রসাধন মাখার নিয়ম

❒ শরীরে ব্যবহারের জন্য ত্বকের আর্দ্রতারক্ষক প্রসাধন, যেমন–ময়েশ্চারাইজার, বডিলোশন, গ্লিসারিন, ভেসিলিন/পেট্রোলিয়াম জেলি কখন ব্যবহার করলে বেশি উপকার পাওয়া যাবে ?

- শীতের প্রসাধন যে কোনো সময়েই ব্যবহার করা যায়। তবে ব্যবহারের আগে যেস্থানে লাগানো হবে সেটি পরিষ্কার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এজন্য গোসলের পর পরই শীতের প্রসাধনগুলো একে একে শরীরের যথাযথ স্থানে লাগানো উচিত। কারণ গোসলের সময় ত্বক কিছুটা পানি শুষে নেয়। শোষিত এই পানিটুকু দেহের ত্বকে আবদ্ধ রাখতে পারলে ত্বক আরো সজীব হবে। তাই গোসলের পরপরই ভেজা ত্বক তোয়ালে দিয়ে আলতোভাবে চেপে চেপে মুছে নিয়ে, ত্বকের ভেজা ভাব থাকা অবস্থাতেই শীতের প্রসাধন মেখে ফেলতে হবে। এইসব প্রসাধন ত্বকের ভিতরকার পানি বেরিয়ে আসতে দেয় না। ফলে ত্বক সজীব থাকবে। আর গোসলের পর ত্বক শুকিয়ে গেলে তখন প্রসাধন মাখলে ততটা লাভ হয় না। কারণ

ত্বকের মধ্যস্থিত সঞ্চিত পানি ততক্ষণে শুষ্ক বাতাস শুষে নিয়ে যায়। তখন ক্রিম/লোশন মাখলে ত্বক তৈলাক্ত ও কোমল হয় কিন্তু বাড়তি সজীবতা পায় না। কাজেই গোসলের পর ত্বকের প্রসাধন মাখার উপযুক্ত স্থান হচ্ছে বাথরুম। বাথরুমে এটি নির্বিঘ্নে সারা যায়।

উষ্ণ গোসল কি ক্ষতিকর ?

❐ শীতের ঠাণ্ডার জনেকেই ঠাণ্ডা পানি দিয়ে গোসল করতে চান না। গোসলের জন্য উষ্ণ পানি ব্যবহার করেন অনেকে। উষ্ণ পানিতে গোসলে ত্বক ঢিলে হয়ে যায়– কথাটি কতটুকু সত্য ?

● আসলে এটি ভুল ধারণা। কুসুম গরম পানি দিয়ে গোসল করলে ক্ষতি নেই। তবে গোসলের সময় দীর্ঘ না হওয়াই ভাল। শরীর ১০-২০ মিনিটের বেশি ভেজা না রাখাকে অনেক চর্মবিশেষজ্ঞ ত্বকের জন্য ভাল বলে মনে করেন। উষ্ণ পানিতে বেশিক্ষণ গোসল না করাই ভাল।

শীতে রুক্ষ ত্বকের জন্য সাবান

❐ কারো কারো ত্বক এতটা রুক্ষ যে ত্বক সহজে কোমল হতেই চায় না অন্তত শীতের সময়। এইসব ক্ষেত্রে কী ধরনের সাবান ব্যবহার করা উচিত ?

● এই অবস্থায় ময়েশ্চারাইজিং নিউট্রাল সোপ ব্যবহার করা সবচেয়ে ভাল। এছাড়া ময়েশ্চারাইজিং বাথজেলও ব্যবহার করা যায়। নিউট্রাল সোপ দামি তাই কিছুটা কম দামি সাবানের মধ্যে সাদা রঙের টয়লেট সোপ বেছে নেয়া যেতে পারে। অথবা গ্লিসারিন সোপ ব্যবহার করা যেতে পারে। আর সাবান খুব বেশি সময় ধরে শরীরে মেখে রাখা ঠিক নয়। আস্তে আস্তে ঘষে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই তা ধুয়ে ফেলা ভাল।

সল্টবাথ কী ?

❐ রুক্ষ ত্বকের জন্য 'সল্টবাথ' কি উপকারী ? যদি উপকারী হয় তবে 'সল্টবাথ'-এর নিয়মটাই বা কী ?

● শীতের প্রভাবে যাদের ত্বক বেশি রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যায় তাদের ক্ষেত্রে 'সল্টবাথ' কিছুটা বাড়তি কোমলতা দেবে। 'সল্টবাথ' মানে স্যালাইন ওয়াটার বাথ। প্রতি দুই গ্লাস অর্থাৎ আধাসের পানিতে তিন আঙ্গুলের এক চিমটি লবন মেশানো পানিকে সল্ট ওয়াটার বলা যেতে পারে। একই অনুপাতে এক বালতি পানিতে পরিমাণ মত লবন মেশালেই তা সল্টবাথের উপযোগী হবে। সল্টবাথের এই পানিতে পা ও শরীর ভিজিয়ে রাখলে পায়ের গোড়ালি ও গোটা শরীরের ত্বক কোমল হবে। এ পানিতে কমপক্ষে ১০ মিনিট ত্বক ভিজিয়ে রাখতে হবে। সল্টবাথ করার জন্য বাথটাব

দরকার। সল্টবাথের পর সাধারণ পানি দিয়ে শরীর ধুতে হবে এবং মুছে তাতে বডিলোশন বা ময়েশ্চারাইজার মেখে দিতে হবে।

পায়ের গোড়ালি ফাটা প্রতিরোধ

❐ অনেকেরই ঘরে খালি পায়ে হাঁটার অভ্যাস। ফলে দেখা যায় পায়ের গোড়ালিতে শুষ্ক সাদাটে দাগ বসেছে অর্থাৎ গোড়ালির ত্বক শুষ্ক হয়ে ফাটার উপক্রম হয়েছে। কারো কারো শীতের সময় এমনিতেই এরকম হয়। পায়ের গোড়ালি ফাটা প্রতিরোধে করণীয় কী ?

● শীত অনেকেরই পায়ের গোড়ালি ফাটে। যারা খালি পায়ে হাঁটেন তাদের সব সময়ই গোড়ালি ফাটতে পারে বা রক্ষা থাকতে পারে। তবে শীতে পায়ের গোড়ালি ফাটার প্রবণতা খুব বেড়ে যায়। এটি প্রতিরোধে, কয়েকটি ব্যবস্থা নিতে হবে–খালি পায়ে হাঁটা যাবে না, পায়ে যেন ধুলো না লাগে, গোসলের সময় খড়খড়ে ফ্লোরে গোড়ালি ঘষে কিংবা ঝামা অথবা গোড়ালি ঘষার বিশেষ উপকরণ দিয়ে ঘষে গোড়ালির মরা চামড়া দূর করতে হবে, গোসলের পর মুছে সেখানে ভেসিলিন গ্লিসারিন লাগাতে হবে, দরকার পড়লে সল্টবাথের স্যালাইন ওয়াটারে পা ১০ মিনিট ভিজিয়ে ঘষে মুছে সেখানে পেট্রোলিয়াম জেলি লাগাতে হবে। এছাড়া দিনের অন্যান্য সময়েও গোড়ালিতে প্রসাধন লাগিয়ে রাখতে হবে।

পায়ের গোড়ালি ফাটলে করণীয়

❐ শীতে যাদের পায়ের গোড়ালি ইতোমধ্যে ফেটে গেছে তাদের ক্ষেত্রে করণীয় কী ?

● পায়ের গোড়ালি ফেটে গেলে ৫%-১০% স্যালিসাইলিক এসিড জাতীয় মলম গোড়ালিতে ঘষে পরিষ্কার করে ধুয়ে মুছে সেখানে লাগানো যেতে পারে। নিয়মিত এটি ব্যবহারে গোড়ালির ফাটা কমে যাবে। সেরে যাওয়ার পর গোড়ালি ফাটা প্রতিরোধে করণীয় বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হবে। তবে পায়ের গোড়ালি বেশি ফাটলে চর্মবিশেষজ্ঞের পরামর্শে চিকিৎসা করাতে হবে। পরে গোড়ালি ফাটা অবস্থায় কোনক্রমেই খালি পায়ে হাঁটা যাবে না। এতে গোড়ালির ফাটা ফাঁকে ধুলো ময়লা ঢুকে অবস্থার অবনতি ঘটাবে।

শীতে ত্বকের যত্নে পানি পান

❐ অনেকেই বলেন, শীতের সময় বেশি পানি পান করা ত্বকের জন্য ভাল. আসলেই কি তাই ?

● শীতের সময় বাতাসে আর্দ্রতা কম থাকে। তাই শরীরের ত্বক কিছুটা শুষ্ক হয়ে পড়ে। তাই শুষ্কতা পূরণের জন্য বাড়তি পানি পান করা শরীরে জন্য উপকারী। শীতে শরীরে ঘাম কম হয় বলে প্রস্রাব বেশি হয়। বেশি প্রস্রাব হওয়াটা তখন স্বাভাবিক। প্রতিদন একজন পূর্ণবয়স্ক লোকের কমপক্ষে ৩ লিটার পানি পান করা উচিত।

শীতে ত্বকের পুষ্টি

❐ ত্বকে পুষ্টি ও সৌন্দর্যের জন্য শীতকালে কী ধরনের খাবার খাওয়া যেতে পারে ?

● পুষ্টিসম্পন্ন ত্বক মানেই সুন্দর ত্বক। ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান গ্রহণের শীতের চেয়ে ভাল, সুযোগ আর নেই। কারণ শীতকালে প্রচুর সবুজ ও হলুদ শাক সবজি ও শাক পাতা পাওয়া যায় যা অন্যকোনো ঋতুতে পাওয়া যায় না। এই সবজিতে রয়েছে ত্বকের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন (ই,বি,সি) এন্টি অক্সিডেন্ট ও জিংক। যা ত্বকের পুষ্টি যোগায় ও সৌন্দর্যের বিকাশ ঘটায়। শাকসবজি-র এন্টি অক্সিডেন্ট উপাদান সূর্যরশ্মির বিরূপ প্রভাবের কারণে ত্বকে সৃষ্ট ক্ষতিকর ফ্রি রেডিক্যালসকে দূর করে। এই ফ্রি রেডিক্যালস ত্বক বুড়িয়ে যাওয়ার পেছনে শতকরা ৬০-৮০ ভাগ দায়ী। যার ফলশ্রুতিতে ত্বক ঢিলে হয়ে যায় ও ভাঁজ পড়ে। খাবারের পাশাপাশি ত্বকে বয়সের ভাঁজ রোধক ভিটামিন-ই ক্রীম বা লোশন মাখা যেতে পারে।

পা ও জুতোর গন্ধ

❐ শীতের সময় অনেকের ক্ষেত্রে, জুতো খোলার সাথে সাথে দমবন্ধ হওয়া দুর্গন্ধ বের হয়। অথচ বছরের অন্যান্য সময়ে এমনটি হয়না। এমনটি কেন হয় ?

● শীতকালে সব সময় জুতো পরে থাকার কারণে পায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। যেহেতু এ সময় শরীরের অন্যান্য অংশ ঠাণ্ডা থাকে তাই সেখান থেকে ঘাম বের হয় না। আর জুতামোজা পরা অবস্থায় পা গরম থাকে বলে সেদিক দিয়েই ঘাম বেরোনোর ধুম লেগে যায়। এই অতিরিক্ত ঘাম ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে দুর্গন্ধ তৈরি করে।

জুতার দুর্গন্ধ প্রতিরোধে করণীয়

জুতা খোলার সাথে সাথে পা থেকে এমন দুর্গন্ধ বের হতে থাকল যে, একেবারে দম বন্ধ হয়ে যাবার মতো অবস্থা। ভদ্রতার কারণে বলাও যায় না যে, আপনার পা থেকে দুর্গন্ধ বের হচ্ছে; সুতরাং পা ধুয়ে আসুন। ভদ্রতার মাথা খেয়ে যদিও বলা যায় যে– পা ধুয়ে আসুন, তাতেও লাভ নেই। কিছুক্ষণ পর আবার পা থেকে দুর্গন্ধ বের হতে থাকেব। বুদ্ধিমানরা হয়ত বুদ্ধি করে জুতাই খোলেন না। কিন্তু এটা তো আর সমাধান হলো না। চাই এর সমাধান। আবার অনেকে এর সমাধানের প্রয়োজন বোধ করেন না। কারণ তাঁদের ধারণা যে, শীতকালে তো পায়ে গন্ধ হবেই। এ নিয়ে দুশ্চিন্তার কি আছে! না, এ জাতীয় ধারণা মোটেও ঠিক নয়।

প্রথমে আসা যাক শীতকালে পা অতিরিক্ত ঘামে কেন ? শীতকালে সব সময় জুতা এবং মোজা পরে থাকাতে পায়ের তাপমাত্রা বেড়ে যায় শরীরের অন্যান্য অংশ থেকে। যেহেতু শরীর ঠাণ্ডা, তাই শরীরে ঘাম হয় না। কোথাও না কোথাও দিয়ে ঘাম বের হবেই, যেহেতু পায়ের তাপমাত্রা বেশি, তাই পা দিয়েই ঘাম বেশি বের হয়।

- এই অতিরিক্ত ঘামে ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে দুর্গন্ধ তৈরি হতে থাকে।

–এই দুর্গন্ধ কিন্তু প্রথমে মোজাতে লাগে এবং আস্তে আস্তে সমস্ত জুতাতে গন্ধ লেগে যায়। তাই জুতাতে গন্ধ লাগার আগেই মোজা বদলাতে হবে। অর্থাৎ একই মোজা পর পর ২ দিন পরা যাবে না। যদি একবার জুতাতে গন্ধ লেগে যায়, তখন আর মোজা বদলে কোন লাভ হয় না। কারণ তখন জুতাই গন্ধের আঁধার হয়ে যায়। সুতরাং শীত আসার পূর্বেই প্রথম থেকে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত (প্রতিদিন মোজা বদলে পরা)।

- এছাড়াও দুর্গন্ধ যেন না হয়, তার কিছু চিকিৎসা ব্যবস্থা আছে যেমন– পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট-এর কয়েকটি দানা হালকা কুসুম গরম পানিতে মিশিয়ে পা প্রতিদিন ২০ মিনিট ভেজাতে হবে–একাধারে ২ সপ্তাহ। পরবর্তীতে সপ্তাহে ১ বার ভেজালেই চলবে। তবে এখানে একটু সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে-পটাশের দানা এমন পরিমাণ মেশাতে হবে (কুসুম গরম পানিতে) যেন পানির রং হালকা বেগুনি হয়। বেশি গাঢ় রং হলে পায়ে পটাশের দাগ পড়বে এবং পা বেশি শুষ্ক হয়ে চুলকানির সৃষ্টি হতে পারে। যদি পটাশের দানা মেশাতে গিয়ে পানির রং গাঢ় হয়ে যায়, তবে আরও পানি মিশিয়ে রং হাল্কা বেগুনি করে নিতে হবে। এই পটাশের প্রভাবে পায়ে একটু কম ঘাম অনুভূত হবে এবং ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমে যাবে (যে ব্যাকটেরিয়া ঘাম থেকে দুর্গন্ধ তৈরি করে)। এইভাবে দুর্গন্ধের পরিমাণ সহনীয় অবস্থায় নিয়ে আসা যাবে।

মোজা ও জুতোর গন্ধ প্রতিরোধে

❐ শীতে জুতো ও মোজার এই দুর্গন্ধ থেকে রেহাই পেতে আগাম কী ব্যবস্থা নিতে হবে?

● একই মোজা পরপর ২ দিন পরা যাবে না। মোজা বদলে নিতে হবে। প্রতিদিন মোজা বদলে নেয়া ভাল। মোজা খোলার পর মোজা মেলে রাখতে হবে, জুতোর মধ্যে রাখা যাবে না। এছাড়া জুতো খোলার পর পা সাবান দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

পায়ের দুর্গন্ধ থেকে জুতার দুর্গন্ধ

❐ কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রতিদিন মোজা বদল করেও পায়ের দুর্গন্ধ যাচ্ছে না। এ ক্ষেত্রে করণীয় কী?

● পায়ের ঘাম ও ব্যাকটেরিয়ার প্রভাবে সৃষ্ট দুর্গন্ধ পা থেকে মোজায় যায় এবং মোজা থেকে জুতোয় যায়। জুতোতে এই দুর্গন্ধ লাগতে কিছুটা সময় নেয়। কাজেই জুতোতে গন্ধ লাগার আগেই মোজা বদলাতে হবে, পা পরিষ্কার রাখতে হবে। যদি একবার এই গন্ধ জুতোতে লেগে যায় তখন আর মোজা বদলে লাভ হয় না। কারণ জুতোই হল তখন দুর্গন্ধের আঁধার।

পায়ের দুর্গন্ধের চিকিৎসা

❐ আবার নিয়মিত মোজা বদলানোর পরও কারো কারো পা থেকে গন্ধ যায় না। যদিও জুতোতে গন্ধ নেই। পায়ের দুর্গন্ধ দূর করার উপায় কী?

● সাধারণভাবে সাবান দিয়ে পা ধোয়ার পরও কারো কারো ক্ষেত্রে পায়ের দুর্গন্ধ রয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেটের কয়েকটি দানা হালকা কুসুম গরম পানিতে মিশিয়ে পা প্রতিদিন ২০ মিনিট ভেজাতে হবে–একাধারে ২ সপ্তাহ। পরবর্তীতে সপ্তাহ ১ বার করে প্রতিরোধক হিসেবে ভিজালে গন্ধ হবে না, কম হবে। তবে পটাশের দানা এমন পরিমাণ মেশাতে হবে যে পানির রং হালকা বেগুনি হয়। বেশি গাঢ় হলে পায়ে পটাশের দাগ পড়বে এবং পা শুষ্ক হয়ে চুলকানির সৃষ্টি হতে পারে।

পায়ের ঘাম প্রতিরোধ

❒ জুতা-মোজা পরার পর কারো কারো পা খুব বেশি ঘামে, বেশি ঘামলে দুর্গন্ধ বেশি হয়। তাই পা যাতে কম ঘামে সেরকম কোনো ব্যবস্থা আছে কিনা ?

● কুসুম গরম পানিতে হালকা রঙ সৃষ্টিকারী পরিমাণের পটাশ দিয়ে তাতে পা ২০ মিনিট ভেজালে পটাশের প্রভাবে পায়ে একটু কম ঘাম অনুভূত হবে এবং ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা কমে যাবে। এই ব্যাকটেরিয়াই ঘামের দুর্গন্ধের জন্য দায়ী। এভাবে ২ সপ্তাহ করার পর পরে প্রতি সপ্তাহে ১ বার করে যে কেউ (যাদের পায়ে দুর্গন্ধ নেই তারাও দুর্গন্ধ প্রতিরোধ করতে ও ঘাম কমাতে) এটি করতে পারেন।

ছোট ছোট সমস্যা ও সম্ভাব্য সমাধান

শীতের মেকআপ

❒ শীতের সময়ে মেয়েদের কী ধরনের মেকআপ নেয়া উচিত ?

● শীতে ত্বক যেহেতু শুষ্ক হয়ে যায় তাই তখন খেয়াল রাখতে হবে মেকআপ এর ফাউন্ডেশন যেন শুষ্ক ত্বকের উপযোগী হয়। আজকাল ত্বকের ধরন অনুসারে–শুষ্ক, তৈলাক্ত ও সংবেদনশীলসহ বেশ কয়েক ধরনের ফাউণ্ডেশন পাওয়া যায়। দিনের বেলার মেকআপ এর ক্ষেত্রে ফাউণ্ডেশন 'সান ফিল্টার' থাকলে ভাল। এ সময়ে ক্রিম ফাউণ্ডেশন যা ঘন, মানসম্পন্ন ও ময়েশ্চারাইজিং সমৃদ্ধ অর্থাৎ ময়েশ্চার রিচ ফাউণ্ডেশনই তখন ভাল হবে। তার মেকআপ তোলার সময় সাবান ব্যবহার না করে ক্লিনজার ব্যবহার করা উত্তম।

শীতে রুক্ষ চুল

❒ শীতের আগমনের সঙ্গে অনেকের ক্ষেত্রেই খুশকির আক্রমণ বেড়ে যায়। খুশকির এই আক্রমণ প্রতিহত করা যায় কীভাবে ?

● শীতে মাথার ত্বক শুষ্ক হওয়ার কারণে খুশকি বেড়ে যেতে পারে। একটি বলে রাখা ভাল– খুশকি কখনো সম্পূর্ণ নির্মূল করা যায় না তবে সাময়িকভাবে দমন করা যায়। শীতের সময় শুষ্ক পরিবেশের ধুলো মাথায় সহজেই দ্রুত

জমে যায়। মাথার এই ময়লা খুশকির অন্যতম কারণ। তাই মাথা পরিষ্কার রাখলেই খুশকি অনেকটা দমন হয় যা পরিষ্কারের জন্য কমপক্ষে ১ দিন অন্তর ময়েশ্চারাইজার বা আর্দ্রতাকারক উপাদান যুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করা যেতে পারে। এছাড়া পাশাপাশি মাথায় এন্টি ড্যানড্রাফ ক্রীম (যেমন-ব্রাইল ক্রিম) মাখা যেতে পারে। খুশকি দমন না হলে চর্ম বিশেষজ্ঞের পরামর্শমত যথার্থ ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, ময়েশ্চারাইজিং শ্যাম্পু দিয়ে প্রতিদিন মাথা ধুলে ক্ষতি নেই।

সৌন্দর্য হানিকর বাজে অভ্যাস

সৌন্দর্য সচেতন আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন যদি নিম্নোক্ত বাজে অভ্যাসগুলো আপনার মধ্যে না থাকে। আর যদি তা থেকেই থাকে তবে ঝেড়ে ফেলুন। কিভাবে ? সেই উপায়গুলোকেই আমরা তুলে ধরেছি।

ঠোঁট কামড়ানো

ঠোঁট শুকনো হয়ে থাকে, ফেটে যাচ্ছে, সব সময় খোসা উঠছে, এ জাতীয় সমস্যায় ভুগে থাকেন অনেকে। ত্বকের অনেক সমস্যা ঠোঁটে এভাবে দেখা দিতে পারে। কিন্তু সমস্যাটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিজের ভুলের কারণে ও অজ্ঞতা থেকে সৃষ্টি হয়। অনেকেরই অভ্যাস থাকে যে, কিছুক্ষণ পর পর জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে দেয়া। এভাবে ভিজাতে ভিজাতে জিহ্বা দিয়ে হঠাৎ অনুভব করা যায় যে ঠোঁটের চামড়ার কিছু অংশ নরম ও ফুলে উঁচুনিচু হয়ে আছে। কোন না কোন সময় ইচ্ছা হলো দাঁত দিয়ে কামড়ে ঠোঁটের চামড়া কেটে দিতে। দাঁত দিয়ে কাটার ফলে চামড়ার কয়েকটি স্তর চলে যায়। নতুন চামড়া যখন আবার গজায় তখন আকাবাঁকা হয়েই গজায় এবং পুনরায় এই উঁচু-নিচু চামড়া দাঁত দিয়ে কেটে দিতে ইচ্ছা করে। এভাবেই প্রক্রিয়াটি চলতে থাকে এবং ঠোঁটের সমস্যা আর ভাল হয় না।

সমাধান : ময়েশ্চারাইজার যেমন লিপগার্ড দৈনিক কয়েকবার এবং আহারের পর পরই (দেরি না করে) মেখে দিবেন। জিহ্বা দিয়ে ঠোঁট ভিজানোর বদ অভ্যাস ত্যাগ করবেন।

অতিরিক্ত ধোয়ামোছা

কিছুক্ষণ পর পর বা কয়েকবার সাবান দিয়ে মুখ হাত ধোয়া অনেকের কাছে অভ্যাসে পরিণত হয়। এটি মোটেও স্বাস্থ্যসম্মত নয়। রাসায়নিক দিক থেকে সাবান কিন্তু ক্ষার (অ্যালকালি)। তাই এটি অতিরিক্ত ব্যবহারে চামড়াতে বিরক্তির সৃষ্টি হতে পারে। চামড়া শুকনো হয়ে যায় এবং লাল লাল ভাব হতে পারে। কখনও কখনও মুখে ব্রণ হতে পারে।

প্রতিকার : যদি সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া প্রয়োজন হয়ই তবে সেটি যেন দৈনিক দু'বারের বেশি না হয়। সাবানের ক্ষেত্রে নিউট্রাল সাবান অর্থাৎ ক্ষারত্বের পরিমাণ খুব কম যেমন— ডোভ সাবান দিয়ে মুখ ধোয়া নিরাপদ।

নেইল পলিশ

বার বার নেইল পলিশ দেয়া এবং তা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে তোলা অনেকের অভ্যাসে পরিণত হয়। যতবার নেইল পলিশ তুলে ফেলা হয় ততবার নখের কিছু স্তর উঠে চলে আসে। অর্থাৎ এ ব্যাপারটি যদি খুব ঘন ঘন হয় তবে নেইল প্লেট (নখের চাড়া) দুর্বল বা খসখসে হয়ে নখের সৌন্দর্য নষ্ট করে। দাঁত দিয়ে নখ কাটার অভ্যাসটিও কিন্তু একইভাবে নখের সৌন্দর্য নষ্ট করে দেয়।

প্রতিকার : খুঁটে খুঁটে নেইল পলিশ তোলার অভ্যাস ত্যাগ করুন। ঘন ঘন নেইল পলিশ রিমুভার ব্যবহারেও নখের একই ধরনের ক্ষতি হতে পারে। সুতরাং বিনা প্রয়োজনে নেইল পলিশ দেয়ারও প্রয়োজন নেই আবার তুলে ফেলারও প্রয়োজন নেই।

টেলিফোন ব্যবহার

ঘন্টার পর ঘণ্টা টেলিফোনে কথা বলা অনেকের অভ্যাস। সেটি প্রয়োজনেই হোক অথবা শুধু গল্প করার ছলেই হোক। টেলিফোনের রিসিভার থুঁতনির যে অংশে লেগে থাকে সেখানে ব্রণ অথবা এলার্জির সৃষ্টি হতে পারে।

প্রতিকার : টেলিফোনের রিসিভার থুতনিতে না লাগিয়ে কথা বলবেন এবং সময়ে সময়ে পাশ পরিবর্তন করে নিবেন। মাঝে মধ্যে রিসিভার স্পিরিট দিয়ে মুছে পরিষ্কার করে নিবেন।

পুরনো মেকআপ ব্রাশ

অনেকেই মেকআপে ব্যবহৃত ব্রাশ ও স্পঞ্জ ব্যবহারের পর ফেলে রাখেন এবং পরবর্তীতে আবার তা ব্যবহার করেন। এতে কি ত্বকের ক্ষতি হয়?

সমাধান : ফাউন্ডেশনের কাজে ব্যবহৃত স্পঞ্জ ব্যবহারের পর সাবানের পানি অথবা শ্যাম্পু দিয়ে ভাল করে ধুতে হবে স্পঞ্জ চিপে ধরার পর যখন সাবানের ফেনা আসবে না ততক্ষণ পর্যন্ত। মেকআপ ব্রাশ পানি দিয়ে ধুয়ে মুছে রাখবেন।

গ্রীষ্মে ত্বকের যত্ন

অনাদিকাল থেকে মানুষ বিশ্বাস করে আসছে যে, বয়স বেড়ে গেলেই শরীরে ত্বকে ভাঁজ পড়ে এবং সে বুড়িয়ে যায়। কিন্তু বয়সের চেয়ে বিশ্বাসঘাতক যে জিনিসটা মানুষের ত্বককে বেশি করে বুড়িয়ে দিচ্ছে সেটা হলো সূর্যালোক। হ্যাঁ, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি অল্প বয়সী যে কারও ত্বকের দারুণ ক্ষতি করে তাকে বৃদ্ধে রূপান্তরিত করে ফেলছে। ত্বকে শুধু ভাঁজ পড়াই নয়, ত্বককে বিবর্ণ করে তোলে এবং ত্বকের ক্যান্সার ঘটায় সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি। ত্বকের কোষগুলো মরে গিয়ে ত্বক হারিয়ে ফেলে তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য। ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে বিজ্ঞানীরা আজ উঠে পড়ে লেগেছেন। সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে প্রতিহত করতে আবিষ্কার করেছেন সানস্ক্রিন ক্রীম এবং একমাত্র সানস্ক্রিন ক্রীমই এখন পারে গ্রীষ্মে আপনার ত্বককে কোমল, পেলব ও মোহনীয় করে তুলতে।

সানস্ক্রিন সম্পর্কে পুরনো ধারণা বাতিল করুন

অধিকাংশ লোক মনে করেন সানস্ক্রিন ক্রীম শুধুমাত্র গ্রীষ্মের প্রখর রোদে বেরোবার আগে মেখে বের হতে হয়। কিন্তু এ ধারণাটি এখন ভুল পরিণত হয়েছে। সব ঋতুতেই আপনাকে সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে যদি সত্যিই আপনি ত্বকের যৌবন ধরে রাখতে চান।

উৎকৃষ্ট সানস্ক্রিন ব্যবহার করুন

এ কথা অনেকবার আপনি শুনে থাকবেন যে, যখন সানস্ক্রিন ব্যবহার করবেন সেই সানস্ক্রিনে সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর যেন কমপক্ষে ১৫ থাকে। অর্থাৎ ১৫-এর নিচে সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর থাকলে তা ত্বকের কোন কাজে আসে না। বাজারে অনেক ধরনের সানস্ক্রিন রয়েছে। এর কোনটিতে সান প্রোটেকশন ফ্যাক্টর বা এসপিএফ ৩০ কোনটিতে ৪৫, এমনকি ৬০ও রয়েছে। কিন্তু আপনার জন্য প্রযোজ্য কোনটি ?

কিভাবে বুঝবেন কোন সানস্ক্রিনটি আপনাকে ব্যবহার করতে হবে ?

সানস্ক্রিন ব্যবহার করার পূর্বে আপনাকে জানতে হবে এসপিএফ অর্থ কি ? এটার অর্থ হলো রোদে থাকার ফলে আপনার ত্বক পুড়ে যাবার আগে এ পদার্থটি কতক্ষণ আপনার ত্বকে স্থায়ী থাকে ? এটা হলো এমনই এক পদার্থ যা মূলত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিকে প্রতিহত করে। একটি এসপিএফ ১৫ লোশন বা ক্রীমের গুণগত অর্থ হলো অরক্ষিত অবস্থায় আপনার ত্বক যেটুকু রক্ষা পেতে পারে। এসপিএফ ১৫ লোশন বা ক্রীম আপনার ত্বকে তার চেয়ে ১৫ গুণ বেশি রক্ষা করে। তেমনি এসপিএফ ৮ সানস্ক্রিনটি ৮ গুণ বেশি রক্ষা করে।

আপনার ত্বকের বর্ণ এ ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি আপনি দেখতে ফর্সা হন এবং রোদে ১০ মিনিট কাটালেই ত্বক পুড়ে যায় তাহলে আপনি যদি এসপিএস ১৫ সানস্ক্রিনটি মাখেন সে ক্ষেত্রে আপনি সহজেই ১৫০ মিনিট রোদে থাকতে পারবেন। সানস্ক্রিনটি ১৫০ মিনিট ধরে আপনার ত্বককে রক্ষা করবে। আর যদি রোদে ২০ মিনিট কাটালে আপনার ত্বক লাল হয়ে ওঠে তাহলে এ সানস্ক্রিনটি আপনাকে ৩০০ মিনিট অর্থাৎ পাঁচ ঘন্টা ধরে রক্ষা করবে। এসপিএফ কেবলমাত্র সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি 'বি' এর বেলায় প্রযোজ্য।

নাজুক ত্বকের লোকদের জন্য এসপিএফ ১৫ হলো উৎকৃষ্ট সানস্ক্রিন। এটা প্রায় ৯৫ শতাংশ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি 'বি'-কে প্রতিহত করে। কালো ত্বকের লোকদের জন্য এসপিএফ ৮ থেকে ১২ যথেষ্ট। কারণ কালো ত্বকের লোকদের শরীরে মেলানিন নামক যে রঞ্জক পদার্থ থাকে সেটাই প্রাকৃতিক সানস্ক্রিন হিসাবে কাজ করে। আর এ কারণেই এশিয়ার অধিবাসীদের ত্বকের ক্যান্সার কম হয়। কিন্তু কালো ত্বক ফেটে যায় ও ত্বকে দাগ হয়। তাই ত্বকের কুঞ্চন রোধ করতে সানস্ক্রিন ব্যবহার করতে হবে। এখানে ঋতু কোন বিষয় নয়। সব ঋতুতেই সানস্ক্রিন সমান প্রযোজ্য। অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ এসপিএফ ৩০-এর ওপরে যাবার কোন বিশেষ কারণ খুঁজে পান না। এসপিএফ ৩০ সানস্ক্রিন ৯৭ শতাংশ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি 'বি' কে প্রতিহত করে।

উচ্চমাত্রার এসপিএফ ত্বককে সুরক্ষা করে বটে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর রাসায়নিক উপাদানসমূহ ত্বকে চুলকানি ও জ্বালাপোড়া সৃষ্টি করে।

গাঢ় করে সানস্ক্রিন মাখুন

আপনি শুধু সানস্ক্রিন মাখার কথাই শুনছেন, কিন্তু কি পরিমাণ সানস্ক্রিন আপনি ত্বকে মাখবেন ? আপনি মুখমণ্ডলের জন্য প্রায় এক চা চামচ এবং সমস্ত শরীরের জন্য দু'চা চামচ সানস্ক্রিন মাখুন। যদি আপনি এর অর্ধেক মাখেন তাহলে আপনার প্রতিরক্ষার মাত্রা অর্ধেক কমে যাবে।

লোশন কিনুন দেখেশুনে

আপনি যদি অন্য সানস্ক্রিন লোশন কিনতে চান আপনি অবশ্য চেক করে নেবেন তাতে জিঙ্ক অক্সাইড এবং টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড আছে কিনা। এরা এভোবেনজোন কিংবা অন্যান্য রাসায়নিক সানস্ক্রিন উপাদানের মতো ত্বকের গভীরে প্রবেশ করে সূর্যরশ্মিকে শুষে নেয় না, বরং এরা শরীরের প্রতিবন্ধক হিসাবে কাজ করে অর্থাৎ এরা ত্বকের উপরিভাগে অবস্থান করে এবং সূর্যরশ্মিকে প্রতিফলিত করে। জিঙ্ক অক্সাইড কিংবা টাইটানিয়াম ডাইঅক্সাইড সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি 'এ'-কেও প্রতিহত করে। যেহেতু এ উপাদান দুটো ত্বকে শোষিত হয় না তাই সংবেদনশীল ত্বকের জন্য এরাই উৎকৃষ্ট।

সব জায়গায় সানস্ক্রিন

আপনি শুধু স্থলেই নয়, পানিতে ডুব দেয়ার আগেও ওয়াটারপ্রুফ সানস্ক্রিন মেখে নিতে পারেন। একটি কথা মনে রাখতে হবে, সানস্ক্রিন ত্বকে মাখার সাথে সাথেই সেটা কাজ করা শুরু করে দেয়। আপনি যখন ভেজা অবস্থায় রয়েছেন তখন সানস্ক্রিন ৮০ মিনিট আপনাকে রক্ষা করে। তাই প্রতি এক ঘন্টা বা দু'ঘন্টা অন্তর সানস্ক্রিন মাখতে হবে।

কসমেটিক্স বা প্রসাধন হিসাবে গণ্য করবেন না

এসপিএফ ময়েশ্চারাইজার, ফাউন্ডেশন এবং অন্যান্য ত্বকের প্রসাধন নিয়ে আপনি যা ধারণা করেন সেগুলো আপনার ধারণার চেয়ে ত্বককে কম রক্ষা করে। সর্বদা পূর্ণমাত্রায় এসপিএফ ব্যবহার করতে হবে। অর্থাৎ প্রায় এক চা চামচ সানস্ক্রিন আপনার মুখে মাখতে হবে। অথচ প্রসাধনী হিসাবে মাখতে গেলে আপনি সেটা পারবেন না। সবচেয়ে ভাল হয় আপনি যখন কমেটিক্স কিনবেন তাতে যদি জিঙ্ক অক্সাইড কিংবা টাইটানিয়াম ডাই অক্সাইড থাকে। কসমেটিক্স কেনার আগে তাই লেবেলটা দেখে নিন।

ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খান

সম্প্রতি জার্মানিতে এক গবেষণায় দেখা গেছে পর্যাপ্ত ভিটামিন সি ও ভিটামিন-ই ত্বককে সূর্যের আলোয় পুড়ে যাওয়া থেকে রক্ষা করে। বেশি করে সবুজ ও হলুদ ফল এবং সবজি খান (এগুলোতে ক্যারোটেনয়েড থাকে)।

খাদ্য যখন ক্ষতিকরক

অনেকে বিভিন্ন ধরনের খাদ্যদ্রব্য যেমন আম, লেবু, গাজর, প্রভৃতির রস ত্বকে মেখে থাকে। কিন্তু এ রসে থাকে 'সোরালেন' নামক উপাদান। যদি আপনার ত্বক

সংবেদনশীল হয় এবং আপনি এসব রস ত্বকে মাখেন তাহলে সোরালিনের প্রভাবে আপনার ত্বক রোদে সহজেই পুড়ে যাবে। এমনকি আপনি যদি এসব ফল খেয়েও থাকেন তাহলে রোদে বেরুবার আগে দয়া করে ত্বক ধুয়ে নেবেন যেন রস ত্বকে লেগে না থাকে।

ওষুধ যখন ত্বকের শত্রু

কিছু কিছু ওষুধ সেবনের ফলে আপনার ত্বক সহজেই রোদে পুড়ে যেতে পারে। এসব ওষুধের মধ্যে রয়েছে আইবুপ্রোফেন, এন্টিবায়োটিক টেট্রাসাইক্লিন ও ডক্সিসাইক্লিন এবং গর্ভনিরোধক বড়ি। এসব ওষুধ সেবনের ফলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি আপনার শরীরের ত্বকে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যদি আপনি আপনি কোন ওষুধ সেবন করে থাকেন তাহলে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের মতামত নেবেন যে, এতে আপনার আলোর প্রতিক্রিয়া হবে কিনা এবং এর জন্য অতিরিক্ত সতর্কতা নিতে হবে কিনা।

ব্রণ সম্পর্কে সতর্ক থাকুন

আপনি কি জানেন সূর্যরশ্মির কারণে ত্বকে ব্রণ দেখা দিতে পারে ? যাঁরা রোদে দীর্ঘক্ষণ থাকেন তাঁদের ত্বকের প্রাকৃতিক তেল স্বাভাবিকভাবে নিঃসরণ হতে পারে না। লোমকূপ আটকে গিয়ে সেখানে ব্যাকটেরিয়ার সংস্পর্শে বিশ্রী ব্রণের সৃষ্টি হয়।

সানপ্রুফ পোশাক পরুন

গরমে এমন পোশাক আপনি পরবেন যা সূর্যের আলোকে প্রতিহত করতে পারে। কিন্তু কেমন হবে সেই পোশাক ? সাধারণ পোশাক পরলে তা ৫ থেকে ৯ এসপিএফ এর কাজ করে উদাহরণস্বরূপ একটি টি-শার্ট এসপিএফ ৭-এর কাজ করে। কিন্তু কালো পোশাক সানপ্রুফ হিসাবে পরুন। এ পোষাক সূর্যের আলোকে প্রতিহত করবে। মাথায় ক্যাপ পরুন কিংবা সব সময় ছাতা মাথায় দিয়ে চলুন।

সময় বেছে চলুন

বাদুড় যেমন সারাদিন লুকিয়ে থেকে সন্ধ্যার আগে বের হয় আপনিও চলুন তেমনভাবে। সকাল ১০টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত সূর্যের আলোতে অতিবেগুনি রশ্মির পরিমাণ তীব্র থাকে তাই বাইরে কোন কাজ থাকলে তা খুব সকালে কিংবা পড়ন্ত বিকালে সেরে ফেলুন।

পানির ব্যাপারে সাবধান হন

পানি এক বিস্ময়কর বস্তু। কিন্তু কি নেই এতে ? দুটো বাজে জিনিস মিশে আছে এর সাথে। একটি ক্লোরিন, অপরটি লবণ। এ দুটো জিনিসই ত্বকে চুলকানি ঘটায়, চুলের ক্ষতি করে, ত্বকের রং পরিবর্তন করে। তাই সুইমিংপুলে গোসল করার সময় কিংবা বাসার পানিতে যদি ব্লিচিং পাউডার দেয়া থাকে সেখানে গোসল করার সময় এসব রাসায়নিক দ্রব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলতে মুখমণ্ডলে পেট্রোলিয়াম জেলি অথবা অন্য কোন ওয়াটার রেজিস্ট্যান্ট ময়েশ্চারাইজার মেখে নিন। চুলে কণ্ডিশনার মাখুন সাঁতার কাটার পর পরই কণ্ডিশনার শ্যাম্পু দিয়ে গোসল সেরে ফেলুন।

নিয়ে চুল যত ভুল

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা... কবি জীবনানন্দ দাশের এই পংক্তি থেকে চুলের প্রতি দুর্বার আর্কষণ ও আকুতির প্রকাশ ঘটেছে। যে নারীর চুল নিয়ে কবি কাব্য করেন, চুলের চিন্তায় সেই নারীর কিন্তু চোখে ঘুম নেই! শুধু নারী কেন ? চুল নিয়ে পুরুষরাও কিন্তু কম ভাবেননা। তাই চুলের যত্নে ব্যবহৃত হয়ে আসছে নানান রকম জিনিস। আর সে কারণে চা পাতা, কফি, লেবু, ডিম ইত্যাদির মত খাদ্যবস্তুকেও দেখা যায় পেটে চালান না করে মাথার উপর রেখে তথাকথিত চুলের যত্নে ব্যবহার করা হচ্ছে। তা ছাড়া চুলের যত্নে তেলের চিরাচরিত অনর্থক ব্যবহার তো আছেই। কিন্তু নিরাশার কথা হচ্ছে এইসব আয়োজনের কোনটাই চুলের মানোন্নয়নে কোন কাজে আসে না। এটাই বৈজ্ঞানিকভাবে সত্যি।

চূল সর্ম্পকে ভুল ধারণা অনেক

চুলের যত্ন, পরিচর্যা, বৃদ্ধি ইত্যাদি নিয়ে অনেকের মধ্যেই বিভিন্ন রকম ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। উত্তরাধিকার সূত্রে এইসব ভুল ধারণাকে আমরা ধারণ করে আসছি। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে মিথ্যে চাকচিক্যে অযথাই পুলকিত হচ্ছি। ফলে চুলের যত্নে যোগ হয়েছে মাত্রাতিরিক্ত বাহুল্য। এবার চুল সম্পর্কে কয়েকটি ভুল ধারণা উল্লেখ করা যাক–

- বার বার চুল আঁচড়ানো ভালো, সুন্দর চুলের জন্য দৈনিক অন্তত ১০০ বার চুলে ব্রাশ বা চিরুনির আঘাত দেয়া ভালো।
- টাইট করে চুল বাঁধলে চুল লম্বা হয়।
- চুল কামালে বা শেভ করলে চুল ঘন ও কালো হয়।
- মাথায় খৈল ব্যবহারের চুলের খুশকি দূর হয়।
- তেল চুলের পুষ্টি যোগায় ও চুল পড়া বন্ধ হয়।
- মাথা ম্যাসেজ করলে চুল বৃদ্ধি পায়।
- চুলে ভিটামিন যুক্ত তেল কিংবা পুষ্টিকর ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার (যেমন ডিম) মাখলে চুল সুন্দর হয়।
- প্রতিদিন চুল ধুয়ে পরিষ্কার করলে চুল নষ্ট হয়ে যায়।
- একটি সাদা চুল তুললে সেখান থেকে দুটি সাদা চুল গজাবে।

চুল সম্পর্কে প্রচলিত এইসব ধারণাগুলোর কোনটাই কিন্তু ঠিক নয়। এইসব ধারণার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। এগুলো মেনে চলা মানে অর্থ ও সময়ের অপচয়। শুধু তাই নয়, এইসব ভ্রান্ত ধারণা প্রয়োগে চুল ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এবার একে একে প্রতিটি ভুল ধারণা সম্পর্কে স্বল্প পরিসরে আলোকপাত করা যাক।

ভুল ধারণা : বার বার চুল আঁচড়ানো ভালো, সুন্দর চুলের জন্য দৈনিক অন্তত ১০০ বার চুলে ব্রাশ বা চিরুনির আঘাত দিতে হবে।

বৈজ্ঞানিক সত্য : বার বার কিংবা খুব জোরে চুল আঁচড়ালে চাপের কারণে চুল ছিঁড়ে অথবা শেকড় সুদ্ধ উঠে আসতে পারে। এছাড়াও—

- অতিরিক্ত চুল ব্রাশের কারণে চুলের সবচেয়ে বাইরের চকচকে আবরণ ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। চুলের এই বাহ্যিক আবরণ চুলের প্রতিরক্ষার কাজ করে থাকে। চুলের বাহ্যিক আবরণ মাথার ঘর্ম গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থের সাহায্যে চুলের ঔজ্জ্বল্য ধরে রাখার চেষ্টা করে। ফলে চুলের উপর আলো পড়লে চুল ঝলমলে দৃত্যি ছড়িয়ে স্বাস্থ্যেজ্জ্বল চুলের উপস্থিতি প্রমাণ করে দেয়। কিন্তু বার বার ব্রাশ করলে চুলের বাহ্যিক আবরণে ঘর্মগ্রন্থি নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ যথার্থ মাত্রায় বিস্তৃত হওয়ার সুযোগ পায়না। ফলে এক্ষেত্রে চুলের উপর আলো প্রতিফলিত হতে পারেনা বলে চুলকে নিষ্প্রাণ ও রুক্ষ দেখায়। চুলের বাহ্যিক আবরণের এই ক্ষতি এক পর্যায়ে চুলের শাঁসকেও আক্রান্ত করতে পারে। যার পরিমাণে চুল হয় রুক্ষ ও ভঙ্গুর।
- ঘন ঘন চুল ব্রাশের কারণে মাথার ত্বকে অবস্থিত ঘর্মগ্রন্থি মাত্রাতিরিক্ত উদ্দীপিত হয়ে সেবাম নামক তৈলাক্ত পদার্থের বাড়তি নিঃসরণ ঘটায়। ফলে তৈলাক্ত পদার্থে সিক্ত হয়ে চুল নেতিয়ে থাকে। এ অবস্থায় চুল আঁঠালো ও চুপসানো দেখায়।
- মাথার ত্বকে খুশকি থাকা অবস্থায় বার বার মাথা আঁচড়ালে মাথার ত্বকে সেবোরিক ডার্মাটাইটিস নামক খুশকি জনিত প্রদাহ হতে পারে। শেষ পর্যন্ত এই প্রদাহ থেকে মাথায় সোরিয়াসিস ও একজিমা হতে পারে।
- জট পাকানো চুলে চিরুণি ব্যবহারের চেষ্টা করলে চুল ছিঁড়ে কিংবা উঠে যাওয়াটাই স্বাভাবিক।
- পার্লার থেকে সেট (পার্ম,কার্ল...) করা চুলে বার বার চিরুণি ব্যবহার করলে চুল নষ্ট হতে পারে। কারণ এসব চুল স্বাভাবিক চুলের তুলনায় ভঙ্গুর ও নরম থাকে।

কাজেই প্রকৃত সত্য হচ্ছে, চুলে অতিরিক্ত চিরুণি বা ব্রাশ ব্যবহার করা ভাল নয়। চুল ব্রাশ করার জন্য আদর্শ চিরুণি হচ্ছে-শক্ত প্লাষ্টিকের তৈরি (ভলাকানাইজ্‌ড) বড় ও ফাঁকা দাঁত বিশিষ্ট চিরুণি। এই ধরনের চিরুণি দিয়ে দিলে ৩/৪ বার চুল আঁচড়ানোটাই হচ্ছে আদর্শ। আর চুল কম আঁচড়ানোটাই ভাল।

ভুল ধারণা : টাইট করে চুল বাঁধলে চুল লম্বা হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য : চুল বাঁধার ব্যাপারে সারা বিশ্বেই একটি বিষয় ব্যাপক ভাবে প্রচলিত হচ্ছে-আটসাঁট করে বা টাইট করে চুল বাঁধা। এর কারণ অনেকের ধারণা টাইট করে চুল বাঁধলে চুল লম্বা হয়। কিন্তু ধারণাটি পুরোপুরি ভুল। চুল টেনে লম্বা করার বস্তু নয়। এটি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। বরং চুল টাইট করে বাঁধলে বিপত্তি আছে। টাইট করে চুল বাঁধার কারণে গোড়া আলগা হয়ে চুল পড়ে যায়। চুল টাইট করে বাঁধার কারণে চুল পড়ার এই রোগকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয়-ট্র্যাকশন এ্যালোপেসিয়া।

দীর্ঘ সময় ধরে টাইট করে চুল বাঁধার কারণে মাথার সম্মুখভাগে টাক দেখা দিতে পারে। কাজেই আলগা করে চুল বাঁধুন।

ভুল ধারণা : চুল কামালে বা শেভ করলে চুল ঘন ও কালো হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য : কারও চুল একটু পাতলা হলে কিংবা লালচে ভাব থাকলেই শুরু হয় শেভ করা বা কামানোর পালা। ছোট বেলায় প্রায় সব শিশুকে ধরে বছরে ২/১ বার করে চুল কামিয়ে দেন মায়েরা। উদ্দেশ্য একটাই তা হচ্ছে, চুল ঘন ও কালো করা। চুল কামানোর এই প্রবণতা যুবক ও বয়স্কদের মাঝেও লক্ষণীয়। আবার কেউ চুল পড়ে যাচ্ছে বলে চুল কামিয়ে ফেলেন। প্রকৃত পক্ষে চুল কামালে চুল ঘন কিংবা কালো কোনটাই হয়না এবং চুল পড়াও বন্ধ হয়না। চুল ঘন কিংবা কালো হওয়ার ব্যাপারটি পুরোপুরিই বংশগত। এর জন্য কোন চিকিৎসা ব্যবস্থা অদ্যাবধি বের হয়নি। তবে চুল পাতলা ও লালচে হওয়ার সঙ্গে অনেক সময় রোগের সম্পর্ক থাকতে পারে। মাথায় কোন ওষুধ লাগানোর সুবিধার্থে চুল কামানোর দরকার হলে তা করা যেতে পারে। কিন্তু চুল ঘন বা কালো করার জন্য চুল কামালে কোনই লাভ নেই।

ভুল ধারণা : মাথায় খৈল ব্যবহারে চুলের খুশকি দূর হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য : মাথায় খুশকি দূর করার জন্য অনেকেই মাথায় সরিষার খৈল ব্যবহার করেন। সরিষা থেকে তেল বের করার পর বর্জ্য হিসাবে প্রাপ্ত এই খৈল গো খাদ্য হিসাবে সমাদৃত। খৈল ব্যবহার করলে মাথার শুষ্ক খুশকিগুলো ভিজে মাথার ত্বকে লেগে থাকে বলে দেখা যায় না। আর একেই অনেকে খুশকি চলে গেছে বলে ভাবেন এবং ভুল করেন। অতএব, খৈল ব্যবহারে খুশকি কখনও দূর হয়না, তা কেবল মাত্র অদৃশ্যমান হয়। চুলে খুশকি হয় বিভিন্ন কারণে। কারণ নির্ণয় করে এই খুশকি দূর করতে হবে। বিভিন্ন ধরনের খুশকির বিভিন্ন চিকিৎসা। তবে খুশকি সম্পূর্ণ রূপে নিরাময়ের কোন গ্যারান্টি নেই। চিকিৎসা ও পরিচর্যার মাধ্যমে একে কেবল দমিয়ে রাখা যায়। আর সেটাই আসল কাজ। এন্টি ড্যান্ড্রাফ শ্যাম্পু, এন্টি ফাঙ্গাল প্রিপারেশন ব্যবহার এবং চুল শুকনো ও পরিষ্কার রাখা প্রয়োজন। একজন চর্ম বিশেষজ্ঞই খুঁজে বের করতে পারেন খুশকির কারণ ও তার যথাযথ চিকিৎসা। কাজেই অযথা মাথায় খৈলের বোঝা না বাড়িয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। খৈল ব্যবহারে তাৎক্ষণিকভাবে পুলকিত হবেন কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হবেনা।

ভুল ধারণা : তেল চুলের পুষ্টি যোগায় ও চুল পড়া বন্ধ হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য : যদিও চুলের যত্নে তেলের ব্যবহার অতি প্রাচীন কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে চুলে তেল ব্যবহারে কোন লাভ হয় না। তেল চুলের কোন পুষ্টির কাজে আসে না। চুলের পুষ্টি চুল শিকড়ের মাধ্যমে শরীর থেকেই গ্রহণ করে থাকে। চুলের তৈলাক্ততা রক্ষার জন্য মাথার ত্বকে অবস্থিত সিবাসিয়াস গ্ল্যান্ড থেকে এক ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসৃত হয়ে থাকে। এই তৈলাক্ত পদার্থের মাধ্যমে চুল নিজেই নিজের সৌন্দর্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। কাজেই চুলের সৌন্দর্য রক্ষায় তেলের কোন দরকার নেই। অনেকে মনে করেন তেল চুল পড়া রোধ করে-এ ধারণাটিও ভুল। চুল পড়ার

অনেক কারণ আছে। এইসব কারণের কিছু কারণ চিকিৎসা যোগ্য আর কিছু রয়েছে অচিকিৎসাযোগ্য। তেল চুল পড়ার চি্কিৎসায় কার্যকরী বলে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাছে কখনো বিবেচিত হয়নি। চুলে তেল ব্যবহার পুষ্টিগত কোন লাভ নেই। কিন্তু তেল ব্যবহারে কখনো কখনো চুলের ক্ষতি হওয়ার আশংকা থাকে। তেলের পিএইচ কম হলে অর্থাৎ তেলের এসিড মাত্রা বেশি থাকলে সে ক্ষেত্রে চুল লালচে হয়ে যায়। আর এটি ধরা পড়ে চুলে যখন তেল দেয়া বন্ধ করা হয় তখনই। হালকা রঙের কাপড় ভেজা অবস্থায় যেমন গাঢ় রঙের দেখায় শুকালেই ফ্যাকাসে রূপ ধারণ করে চুলের লালচে ভাবের ক্ষেত্রেই ভ্রান্তি ঘটে। কাজেই তেল চুলকে কালো করে বলে যে ধারণা করা হয় সেটিও মিথ্যে।

ভুল ধারণা : মাথা ম্যাসেজ করলে চুল বৃদ্ধি পায়।

বৈজ্ঞানিক সত্য : মাথা ম্যাসেজে চুল লম্বা, ঘন ও ঝলমলে হয় এমন একটি ধারণা অনেক দিন থেকে প্রচিলত আছে। এর পেছনে যুক্তি হচ্ছে মাথা ম্যাসেজ করলে চুলের গোড়ায় রক্ত সরবরাহ বেড়ে যায়। এই ধরনের ডাক্তারি যুক্তি বিশ্বাস না হওয়ার কথা নয়। কিন্তু মাথার ত্বকে স্বাভাবিক ভাবেই রক্ত সরবরাহ এতটা বেশি যে সেখানে ম্যাসেজ করে বাড়তি রক্ত সরবরাহের দরকার নেই। তা ছাড়া চুলের বৃদ্ধি, লম্বা, ঘন অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ সৌন্দর্যের প্রায় পুরোটাই জন্মগত ভাবে অর্জিত হয়, আর কিছুটা নির্ভর করে যত্নের উপর। প্রকৃতপক্ষে চুলের যত্ন মানে চুলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা। কাজেই মাথা ম্যাসেজ করে মানসিক শিথিলায়ন হতে পারে কিন্তু চুলের কোনই লাভ হবে না।

ভুল ধারণা : চুলে ভিটামিন যুক্ত তেল কিংবা পুষ্টিকর ও ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার (যেমন- ডিম) মাখলে চুল সুন্দর হয়।

বৈজ্ঞানিক সত্য : চুল পুষ্টি সংগ্রহ করে শেকড়ের মাধ্যমে। শেকড় জটিল প্রক্রিয়ার মাধ্যমে রক্ত থেকে এই পুষ্টি গ্রহণ করে থাকে। চুলের যাবতীয় পুষ্টি আসে রক্ত থেকে। তাই চুলে পুষ্টি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখার জন্য খাবারে চুলের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি ও খনিজ পদার্থ গ্রহণ করতে হবে। আমরা যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করি তা সরাসরি শরীরের কাজে লাগেনা, খাদ্যদ্রব্য মুখ থেকে পাকস্থলী ও পরিপাকতন্ত্র পর্যন্ত হজমের জটিল প্রক্রিয়ার পর তা শরীরের কাজে আসে। কাজেই সরাসরি কোন খাদ্যদ্রব্য চুলে মেখে লাভ হবেনা। তাছাড়া চুল বাইরে থেকে কোন ধরনের পুষ্টি উপাদান বা ভিটামিন গ্রহণ করার ক্ষমতাই রাখে না। তখন চুলের গায়ে দুনিয়ার যাবতীয় পুষ্টি ও ভিটামিনের ভান্ডার ঢেলে দিলেও কোন লাভ হবে না। সুতরাং তেলে ভিটামিন থাকলেই কী আর না থাকলেই কী! কাজেই পুষ্টিকর খাবার মাথায় না ঢেলে পেটে চালান করলে অনেক লাভ হবে। আর তেলের বিজ্ঞাপণে যেসব প্রতিশ্রুতির কথা বলা হয় সেগুলো সর্বৈব মিথ্যা। ব্যবসায়িক ফায়দার জন্যই বিজ্ঞাপণের এই ফাঁদ।

ভুল ধারণা : প্রতিদিন চুল ধুয়ে পরিষ্কার করলে চুল নষ্ট হয়ে যায়।

বৈজ্ঞানিক সত্য : প্রকৃত পক্ষে ময়লাই হচ্ছে চুলের আসল শত্রু। চুলে ধূলো ময়লা লেগে থাকলে তা চুলের বাহ্যিক আস্তরণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ময়লা হলে চুল প্রথমে

আঁঠালো হয়ে যায়, পরে তা মলিন হয়ে চুপসে থাকে। কাজেই চুল পরিষ্কারের মাধ্যমে চুলের ময়লা ও মাথার ত্বকের মৃত কোষ দূর করাটাই আসল কাজ। চুল পরিষ্কার থাকলে মাথার ত্বকের সেবাম গ্রন্থি থেকে নিঃসৃত তৈলাক্ত পদার্থ প্রতিটি চুলের গায়ে সমভাবে ছড়াতে পারে। ফলে চুল দেখতে চক্চকে লাগে। আর চুল পরিষ্কার করা মানেই হচ্ছে শ্যাম্পু/কোমল সাবান দিয়ে চুল ধোয়া। কেউ কেউ দৈনিক চুল ধোয়া নিয়ে দ্বিধায় থাকেন। তাদের ধারণা দৈনিক চুল ধুলে চুল উঠে যায়। আসলে এই ধারণাটি ঠিক নয়। বরং চুলে ময়লা থাকলে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি চুল পড়ে যায়। সুতরাং চুল পরিষ্কার রাখলেই চুল কম পড়বে। চুল পড়া রোধে তথা চুল পরিষ্কার রাখতে প্রতিদিন চুল ধোয়া যায়। এতে কোন ক্ষতি নেই।

ভুল ধারণা : একটি সাদা চুল তুললে সেখান থেকে দুটি সাদা চুল গজাবে।

বৈজ্ঞানিক সত্য : একটি সাদা চুল তুলে ফেললে সেখান থেকে যথাসময়ে একটি সাদা চুলই নতুন করে গজাবে। এ ক্ষেত্রে দুটি চুল গজানোর কোন সুযোগ নেই। চুল সাদা হওয়ার জন্য দায়ী উপাদানটি হচ্ছে মেলানিন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মেলানিনের মাত্রা ক্রমশ কমে যাওয়ার কারণেই চুল ধূসর থেকে সাদা হতে থাকে। চুল যখন সাদা হওয়ার তখন তা এমনিতেই হতে থাকে। এক্ষেত্রে একটি সাদা চুল তুলে ফেললে সেখান থেকে দ্বিগুণ সাদা চুল গজানোর কোন সুযোগ নেই। এ ধরনের চিন্তা অবান্তর।

চুল সম্পর্কে এরকম অনেক ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত আছে। যেমন অনেকে মনে করেন লেবুর রস কিংবা মেহেদী ব্যবহারের চুলে কোন ক্ষতি হয়না। এ ধারণাটিও পুরোপুরি সঠিক নয়। কোনকিছু ব্যবহারে চুলে ক্ষতি হবে কি হবেনা তা নির্ভর করে "পি-এইচ ব্যালেন্স" এর উপর। অর্থাৎ চুলে যে উপাদানটি লাগানো হচ্ছে তার এসিড মাত্রা কতটুকু সেটি একটি ধর্তব্যের বিষয়। কোন উপাদানের পি-এইচ ৭ হলে তাকে নিরপেক্ষ বলে বিবেচনা করা হয়। চুলের সঠিক পি-এইচ হচ্ছে ৫.৫। এই অবস্থায় চুল সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী থাকতে সক্ষম হয়। গবেষকরা দেখেছেন মেহেদীর পি-এইচ ৪.৫ । এই মাত্রার কোন উপাদান চুলে লাগালে তা চুলকে ভঙ্গুর করে তুলতে পারে। কিন্তু এ ব্যাপারে অনেকেই সচেতন নন। উল্টো দেখা যায় যেসব বিষয় গুলো চুলের ক্ষতি করছে সেগুলোকে মিথ্যে সচেতনতার বশে আগ্রহ ভরে গ্রহণ করা হচ্ছে। যেহেতু চুল সৌন্দর্যের একটি অপরিহার্য উপাদান তাই এ নিয়ে বিভ্রান্তিও বেশি। অনেকের ধারণা চুল সমস্যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের কোন বিষয় নয়, এটি বিউটিশিয়ানদের ব্যাপার। সাধারণের এই ধারণা মোটেও ঠিক নয়। চুল শরীরেরই একটি অঙ্গ। এর কোন সমস্যা চিকিৎসা বিজ্ঞনের পরিভাষায় কোন না কোন রোগ হিসাবে চিহ্নিত। হতে পারে চুল সমস্যার সব সমাধান এখনও উদ্ভাবিত হয়নি। যে সমস্যার সমাধান আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের হাতে নেই সে সমস্যার সমাধান বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নয় এমন কোন ব্যক্তি বিশেষের কাছে রয়েছে সেটা মনে করা কতটুকু জ্ঞানের পরিচায়ক ? কাজেই চুল সমস্যার সমাধান খুঁজতে চর্ম বিশেষজ্ঞের (ডার্মাটোলজিস্ট) পরামর্শ নেয়াটাই যুক্তিযুক্ত। এই বিশ্বাস টুকু দিয়েই চুল নিয়ে ভুল ধারণা দূর হওয়া শুরু হতে পারে।

সোরিয়াসিস

চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে মেডিক্যাল সায়েন্স বিভিন্ন বিষয়ে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। যেমন লিভার বিশেষজ্ঞ, কিডনী বিশেষজ্ঞ ও হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ইত্যাদি আরো অনেক। ঠিক তেমনি ভাবে চর্মরোগ এখন একটি স্বতন্ত্র বিষয়। বর্তমান যুগে ত্বকে কোন সমস্যা হলে রোগী মেডিসিন বিশেষজ্ঞের কাছে না যেয়ে চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞের কাছেই যেয়ে থাকেন।

চর্ম রোগ হিসেবে সোরিয়াসিস চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞগণের কাছে একটি পরিচিত নাম, কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে এটি বোধগম্য নয়। অর্থাৎ যখনই কোন রোগীকে বলা হয় আপনার সোরিয়াসিস হয়েছে, তখনই একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় যে, সোরিয়াসিস কি জিনিস অর্থাৎ এর বাংলা নাম কি ? দুঃখিত এর কোন বাংলা নাম নেই। খুব সাধারণ ভাষায় বোঝাতে গেলে বলতে হয় যে, সোরিয়াসিস দেখতে একজিমার মত কিন্তু একজিমা নয়! একজিমা শব্দটি উচ্চারণ করার সাথে সাথেই রোগীর চেহারায় এমন একটা ভাব ফুটে উঠে যে উনি বুঝতে পেরেছেন। যদিও একজিমা চেনা বা বোঝা খুব সহজ নয়। এর কারণ হচ্ছে যে, এই একজিমা শব্দটি বহুল প্রচলিত। একজিমায় সাধারণত একটি জায়গায় চুলকাতে চুলকাতে কষ ঝরতে থাকে এবং একটা পর্যায়ে ত্বক পুরু হয়ে যায়।

সোরিয়াসিস বিভিন্নভাবে ত্বকে দেখা দিয়ে থাকে, তন্মধ্যে একটি রূপ কিছুটা একজিমার মত। তবে একটু পার্থক্য হলো যে একজিমা চুলকালে যেমন কষ ঝরে, সেক্ষেত্রে সোরিয়াসিসের বেলায় সামান্য রক্ত রক্ত ভাব বা রক্ত মিশ্রিত কষ ঝরে। একজিমাতে ত্বক পুরু হয়ে যায় একটা পর্যায়ে, সোরিয়াসিসেও ত্বক পুরু হয় তবে আবরণের পরিমান (স্কল্‌স বা মড়া চামড়া) একটু বেশি থাকে এবং এই আবরণ চিমটি দিয়ে উঠালে সামান্য বিন্দু বিন্দু রক্ত ভাব দেখা দেয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আবরণের রং হয় সাদা বা সিলভার বা রূপা রংয়ের। সোরিয়াসিস আরো অনেক ভাবে দেখা দিতে পারে।

- মাথায় অনেক দিন বা বছর যাবত খুশকি শ্যাম্পু ব্যবহারে দমে থাকে। কোন এক সময় দেখা যাচ্ছে শ্যাম্পু ব্যবহারেও কাজ দিচ্ছে না, খুশকি বেড়ে যাচ্ছে এবং মোটা আঁশ বা আবরণ দেখা দিচ্ছে ভীষণ চুলকাচ্ছে এবং রক্ত মাখা কষ ঝরছে এটি হতে পারে সোরিয়াসিস।
- পায়ের তলা ও পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে আঁশ বা খোসাভাব, ভীষণ চুলকায়, কখনও কখনও ত্বক ফেটে যায়, হাঁটতে অসুবিধা হয়, ত্বক খসখসে ও মোটা হয়ে যায়। এক্ষেত্রে আঁশের রং সব সময় সাদা বা রূপালী হয় না। ফাংগাস মনে করে অনেকদিন যাবত চিকিৎসা চলছে কিন্তু কোন উন্নতি হচ্ছে না। এটিও হতে পারে সোরিয়াসিস।
- হাতের তালু এবং আঙ্গুলে ঘামাচির মত পানি পানি ফুসকুঁড়ি সাবান পানি ধরলে

বেড়ে যায়। কনটাক্ট ডারমাটাইটিস অর্থাৎ কিছু সংস্পর্শ থেকে হচ্ছে বলে মনে করে এগুলোর ধরতে বারণ করা হয়েছে। কখনো কখনো খুঁজলি পাঁচড়া মনে করা হচ্ছে, একজিমা হিসেবে চিকিৎসা করা হচ্ছে। ফাংগাস হিসেবে চিকিৎসা করা হচ্ছে কিন্তু কোন লাভ হচ্ছে না। এটিও সোরিয়াসিস হতে পারে।

- হাত বা পায়ের নখ ১/২টি বা প্রায় সবগুলো এক সাথে বা পর্যায়ক্রমে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নখে গুঁড়ি গুঁড়ি গর্তভাব। নখ মরে যাচ্ছে, ঝরে যাচ্ছে, আবার নখ গজাচ্ছে আবার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। নখের নীচে মোটা আস্তরণ পড়ছে। নখের গোড়ার ত্বকে প্রদাহ দেখা দিচ্ছে অতিরিক্ত পানি ব্যবহারে ক্যানডিডা নামের ছত্রাক হয়েছে বলে মনে হচ্ছে এবং সেই অনুযায়ী চিকিৎসা হচ্ছে অথচ কোন লাভ হচ্ছে না। এই সবগুলো অবস্থা একই সাথে বিরাজ করতে পারে অথবা আলাদা আলাদা ভাবেও থাকতে পারে।
- ঠোঁট অনেক দিন যাবত ফাটে, পুরু খোসা ওঠে, খাওয়া দাওয়া করতে জ্বলে ভেসিলিন, গ্লিসারিন মেখেও লাভ হচ্ছে না, এই জাতীয় স্টেরয়েড ক্রীম প্রচুর মেখেছেন কিন্তু অবস্থার উন্নতি হচ্ছে না। এক্ষেত্রেও সোরিয়াসিসের আশংকা উড়িয়ে দেয়া যায় না।
- বিশেষ করে কুঁচকি বা অন্যান্য ভাঁজে ভাঁজে যেমন বগল কনুই এর ভাঁজ, হাঁটুর ভাঁজ, স্তনের নীচের ভাঁজ ইত্যাদি জায়গায় এলার্জি অর্থাৎ চুলকায়, কষ ঝরে পেভিসোন জাতীয় ক্রীম ব্যবহারে একটু কমে, কিছু দিন পর আবার হয়। একটা পর্যায়ে পেভিসোন জাতীয় ওষুধেও কাজ হয় না। ফাংগাস মনে করে ফাংগাস নিরাময়ের ওষুধ খেয়েও লাভ হয়নি। গরমে বেড়ে যায়। হতে পারে এ জাতীয় সমস্যাটি সেবোরিক ডার্মাটাইটস কিন্তু সোরিয়াসিস হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।
- অণ্ডকোষের চামড়া চুলকাতে চুলকাতে একজিমার মত হয়ে যাচ্ছে। হতে পারে রিবোফ্লেবিন-এর অভাব (Riboflavin খাওয়াতে সেরে যায়) অথবা নামুলার একজিমা (মানসিক দুশ্চিন্তার কারণে একটি নির্দিষ্ট জায়গা চুলকাতে চুলকাতে একজিমা হয়ে যায়)। কিন্তু সোরিয়াসিসের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয়া যায় না।

ঠিক এমনই ভাবে যে কোন ধরনের এলার্জি জাতীয় চুলকানি বা একজিমার মত চুলকানি যাকে কোন ব্যাখ্যায় ফেলানো যায় না, হতে পারে সোরিয়াসিস যা কিনা Biopsy অর্থাৎ সামান্য একটু ত্বকের অংশ কেটে নিয়ে Microscope এর সাহায্যে রোগ নির্ণয় করানো যায়। তবে দুঃখের বিষয় এই যে সাধারণ মানুষের ধারণা Biopsy মানে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা অর্থাৎ এ যাবত কালে ক্যান্সারেই একমাত্র Biopsy করতে শুনেছেন এবং তখন ভয় পেয়ে সেই চর্মরোগ বিশেষজ্ঞের ত্রিসীমানায় আর ভিড়েন না। চলে যান এমন ডাক্তারের কাছে যার Psoriasis সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই। চলে ভুল চিকিৎসা। (তবে অভিজ্ঞতার আলোকে বিনা Biopsy-তেও রোগ নির্ণয় সম্ভব)

ভুল চিকিৎসার একটি দিক বর্ণনা না করে পারছি না-তা হচ্ছে Prednisolone Oradexon, Deltacortel, Betnilan ইত্যাদি আরো অনেক মুখে খাওয়ার ষ্টেরয়েড জাতীয় ওষুধকে ম্যাজিক ড্রাগ বলা হয়ে থাকে। অর্থাৎ ২/১ দিন এই জাতীয় ওষুধ সেবনে যে কোন ধরনের এলার্জি, একজিমা, এমনকি সোরিয়াসিস দ্রুত নির্মূল হয়ে যায়। ওযুধের দাম খুবই সস্তা (চার আনা, আট আনা এই রকম)। রোগী মনে মনে ভাবছেন যে, চর্ম রোগের বিভাগীয় প্রধানকে অনেক দিন দেখিয়েছি। রোগ ভাল করতে পারলো না আর উমুক ডাক্তার চার আনা দামের ওষুধে এক সপ্তাহের ভিতর ভাল করে দিলো, তাই এখন বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাইকে বলছি, উমুক ডাক্তারের কাছে যান। উনার উপর ডাক্তার হয় না। এবার আবার আসা যাক আপনার অসুখের দিকে। চারআনা দামের ওষুধে ভাল আছেন ওষুধ এখনও খাচ্ছেন, মাঝে মধ্যে ওষুধ বন্ধ করার চেষ্টা করেন। আবার রোগ দেখা দেয় তাই মাঝে মধ্যে নিজে নিজেই চারআনা দামের ওষুধ (ষ্টেরয়েড) খেয়ে যাচ্ছেন, দুই বছর পর আপনার ব্লাড প্রেসার হয়েছে, ডায়াবেটিস দেখা দিয়েছে। হাড় ক্ষয় হতে হতে হাড়ে ব্যথা করে, শরীর ফুলে গিয়েছে, মুখ ফুলে গিয়েছে, শরীরে শক্তি বল কম, কাজের স্পৃহা নেই। বুক ধরফর করে, শরীরে বিভিন্ন ধরনের ইনজেকশন যেমন- ফোঁড়া হওয়া, দাউদ বা ছত্রাক জাতীয় রোগ দেখা দেওয়া, ত্বকে লম্বা লম্বা সাদা সাদা দাগ পড়া ইত্যাদি আরো অনেক অসুবিধা। একটা পর্যায়ে জানতে পারলেন সেই ম্যাজিক ড্রাগ (ষ্টেরয়েড) এর কারণেই আপনার এ সমস্যা তখন আর কিছুই করার নেই। এখন ষ্টেরয়েড বন্ধ করলে চর্মরোগ এমনি বেড়ে যাবে যে, মাসের পর মাস হাসপাতালে ভর্তি থাকতে হবে। অনেক টাকা পয়সা খরচ হবে। সুতরাং একজিমা সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়ে (একজিমা না সোরিয়াসিস) ষ্টেরয়েড জাতীয় ম্যাজিক ড্রাগ খাওয়া একদম হারাম, কারণ একবার খাওয়া আরম্ভ করলে বন্ধ করা কঠিন। কারণ বন্ধ করলেই সোরিয়াসিস যাকে একজিমা মনে করা হয়েছিল। বর্ধিত আকারে সমস্ত শরীরে দেখা দিয়ে যাবে এবং আরো কঠিন রূপে দেখা দেয়, যেমন পুঁজ ভাব হওয়া (Postular Psoriasis)

ঠিক এমনই আরেকটি প্রচলিত ভুল ধারণা আছে যে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খাওয়া। কারণ এলোপ্যাথিকে যেগুলো সুবিধে হতে চায় না হোমিওপ্যাথিকে ভাল হয়। অসুখটি খুব ভাল ভাবেই নিয়ন্ত্রনে রাখা যায়।

চিকিৎসা বিষয়ে একটু পরে আলোচনা করা যাবে। তার আগে যে প্রশ্নগুলো দাঁড়ায় তা হচ্ছে।

সোরিয়াসিসের কারণ কি ?

এর সঠিক কারণ এখন পর্যন্ত বিজ্ঞানীগণ আবিষ্কার করতে পারেন নি। তবে heredity অর্থাৎ যাদের বংশে সোরিয়াসিস হয় তাদের একটা tendency থাকে যে আজ হোক কাল হোক সোরিয়াসিস হবে। বংশে অন্য কারো থাকলে হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়।

হয়তো বা ইতিহাস ঘাটলে দেখা যাবে যে বাবা, মা বা নানা নানী দাদা দাদীর ও একজিমা জাতীয় সমস্যা (যা আসলে সোরিয়াসিসকে) ছিল। তবে বংশে কারো না থাকলেও সোরিয়াসিস হতে পারে। যাদের সোরিয়াসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদের যে কোন ধরনের আঘাত এড়িয়ে চলা উচিত। কারণ আঘাত থেকেই সোরিয়াসিস শুরু হতে পারে। এমনকি একটা জায়গা চুলকাতে চুলকাতে (মজা লাগে তাই চুলকাই) সোরিয়াসিস শুরু হয়ে যেতে পারে। যখন বেশি লাগে এমন জায়গাতে যেমন কনুই (পড়ার টেবিলে) হাঁটু (শক্ত জায়গায় নামাজ পড়া) সোরিয়াসিস দেখা দিতে পারে তাদেরই যাদের সোরিয়াসিস হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, সবার ক্ষেত্রে নয়। অতিরিক্ত মানসিক দুশ্চিন্তা সোরিয়াসিসের তীব্রতা বাড়িয়ে দেয়। সুতরাং প্রাথমিক পর্যায়ে কেউ যদি অসুখটিকে পাত্তা না দেয় তবে এমনিতে সেরে যেতে পারে।

সোরিয়াসিস কি ছোঁয়াছে রোগ ?

যেহেতু এ রোগ কোন ধরনের জীবাণু দ্বারা হয় না তাই এটি ছোঁয়াচে নয়।

সোরিয়াসিস কি নিরাময় যোগ্য ব্যাধি ? চিকিৎসার মাধ্যমে বা নিজে নিজেই এ রোগ সেরে যেতে পারে। অনেক বছর ভাল থাকা যায়। তবে আবার ও হতে পারে। আবার হওয়া না হওয়াটা পুরোটাই ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপর নয়। তবে আবার হলে আবার চিকিৎসা নিতে হবে।

কোন খাবার বিধি নিষেধ আছে কি! এটিকে অনেকে এলার্জি মনে করে বেগুন, চিংড়ি, ডিম ইত্যাদি এলার্জি জাতীয় খাবার খাওয়া বন্ধ করে দেন। এ ধারণাটি ঠিক নয়। তবে রেড মিট অর্থাৎ লাল মাংস খাওয়াতে সোরিয়াসিসের তীব্রতা বেড়ে যায়। সে ক্ষেত্রে লাল মাংস না খাওয়া বা কম খাওয়াই উত্তম। লাল মাংসের ভিতর গরু, মহিষ ইত্যাদি পরে খাসি, মুরগি পরে না। তবে কোন কোন ভুক্তভোগী ইলিশ মাছ খাওয়াতে বেড়ে যাবে বলে থাকেন।

কোন ওষুধে বিধি নিষেধ আছে কি ? আগেই উল্লেখ করেছি যে মুখে খাওয়ার স্টেরয়েড যেমন Prednisolone, Oradexon Betnilan, Deltacortel ইত্যাদি একদম হারাম। এছাড়া ব্লাড প্রেসারের ওষুধ বিশেষ করে বিটা ব্লকার সোরিয়াসিস বাড়িয়ে দেয়। সে ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী বিটা ব্লকার ছাড়া অন্য গ্রুপের ওষুধ দিয়ে ব্লাড প্রেসারের চিকিৎসা নিতে হবে।

চিকিৎসা

চিকিৎসা বিজ্ঞানে দিন দিন নূতন চিন্তা ভাবনা যোগ হচ্ছে। সোরিয়াসিস বিভিন্ন রূপে দেখা দিতে পারে বিধায় বিভিন্ন সময়ে চিকিৎসার Styleও বিভিন্ন। এর চিকিৎসা একজন চর্ম রোগ বিশেষজ্ঞের অধীনে হওয়াই মঙ্গলজনক। তবে একটি সাধারণ ধারণা দেওয়া হলো যে, যদি কখনো কোন একটি জায়গা চুলকাতে থাকে, একজিমার মত হয়ে যেতে থাকে তবে প্রাথমিক পর্যায়ে থেকেই White Vaseline যখন সুযোগ হবে তখনই মেখে জায়গাটা নরম রাখতে পারলে সেই জায়গাটার সোরিয়াসিস হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়।